পিশাচকন্যা

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
facebook.com/ClassicBooksOfShebaProkashon

রকিব হাসান

ইনডিয়ান দম্পতির মৃত্যুকালে তাঁদের কথা দিয়ে ফেঁসে গেল কিশোর।

দুটো অসহায় ছেলেমেয়ের দায়িত্ব চাপল তার কাঁধে।

শহরের সব লোক ছোট্ট মেয়েটার ওপর খেপা।

অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটছে। লাগছে মড়ক।

সবাই দোষ দিতে লাগল মেয়েটাকে।

বলল, ও পিশাচকন্যা–

ওর ইশারাতেই ঘটে যাচ্ছে যত অঘটন।

মধ্যযুগীয় বর্বর কায়দায় ডাইনী পোড়ানো মেনে নিতে পারল না কিশোর।

পারল না মুসা আর রবিনও।

কিন্তু গোটা শহরের বিরুদ্ধে কি করবে ওরা?

নিশেহারা ছেলেমেয়েগুলোকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল বনের জানোয়ার।

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুনবাগিচা, ঢাকা ১০০০
শো-রুম: ৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
শো-রুম: ৩৮/২ক বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

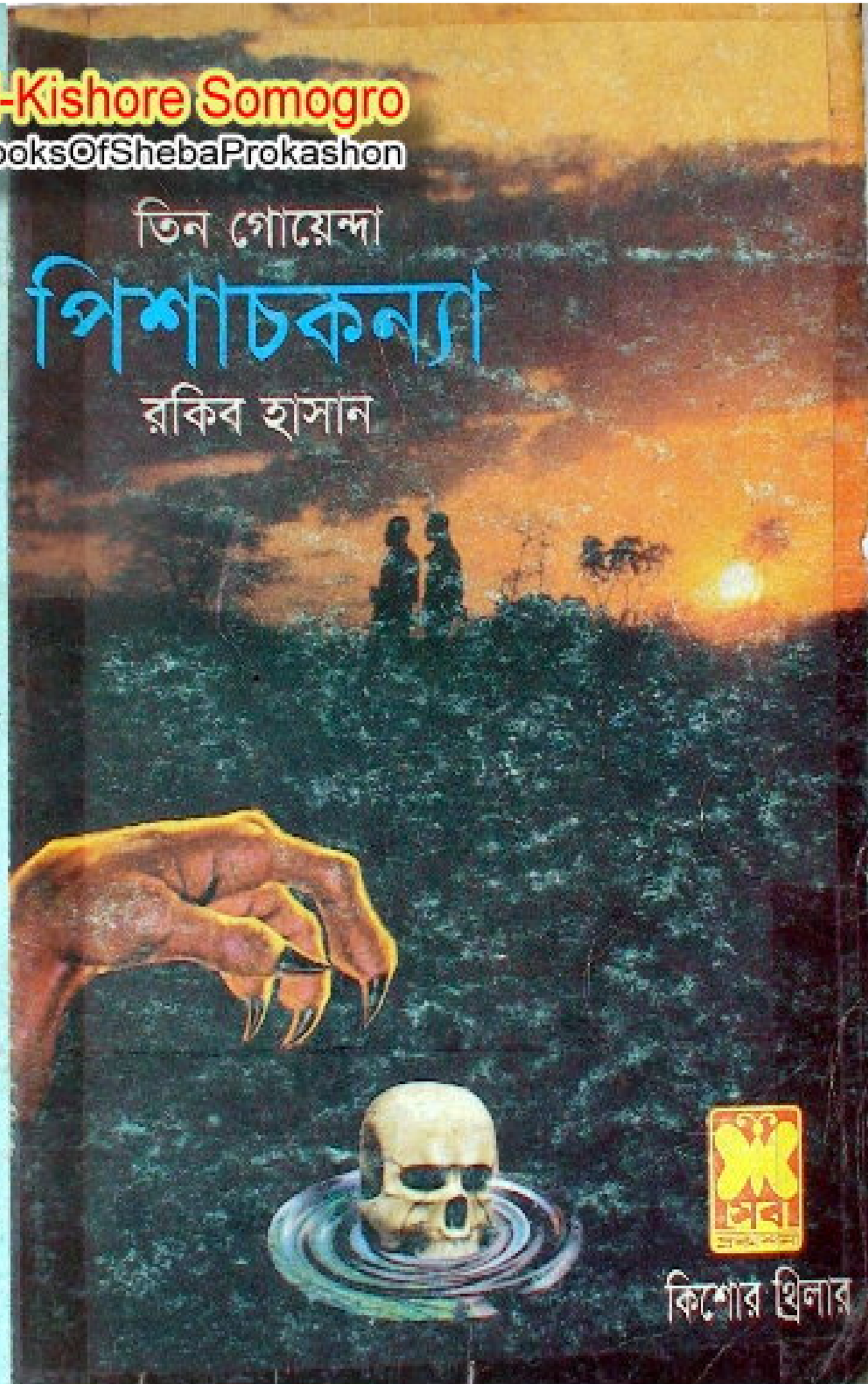

Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Sheba Prokashoni-Kishore Somogro
Book Series
Liked
Following
Message
Timeline
About
Photos
Likes
More

সেবা প্রকাশনীর

আরও ক'টি কিশোর-কাহিনী

তিন গোয়েন্দা সিরিজ:

তিন গোয়েন্দা, কঙ্কাল দ্বীপ, রূপালী মাকড়সা, ছায়াশ্বাপদ, মমি, রত্নদানো, প্রেতসাধনা, রক্তচক্ষু, সাগরসৈকত, জলদস্যুর দ্বীপ ১ ও ২, সবুজ ভূত, হারানো তিমি, মুক্তোশিকারী, মৃত্যুখনি, কাকাতুয়া রহস্য, ছুটি, ভূতের হাসি, ছিনতাই, ভীষণ অরণ্য ১ ও ২, ড্রাগন, হারানো উপত্যকা, গুহামানব, ভীত সিংহ, মহাকাশের আগন্তুক, ইন্দ্রজাল, মহাবিপদ, খেপা শয়তান, রত্নচোর, পুরনো শত্রু, বোম্বেটে, ভূতুড়ে সুড়ঙ্গ, আবার সম্মেলন, ভয়ালগিরি, কালো জাহাজ, পোচার, ঘড়ির গোলমাল, কানা বেড়াল, বাক্সটা প্রয়োজন, খোঁড়া গোয়েন্দা, অথৈ সাগর ১ ও ২, বুদ্ধির ঝিলিক, গোলাপী মুক্তো, প্রজাপতির খামার, পাগল সংঘ, ভাঙা ঘোড়া, ঢাকায় তিন গোয়েন্দা, জলকন্যা, বেগুনী জলদস্যু, পায়ের ছাপ, তেপান্তর, সিংহের গর্জন, পুরনো ভূত, জাদুচক্র, গাড়ির জাদুকর, প্রাচীন মূর্তি, নিশাচর, দক্ষিণের দ্বীপ, ঈশ্বরের অশ্রু, নকল কিশোর, তিন পিশাচ, খাবারে বিষ, ওয়ার্নিং বেল, অবাক কাণ্ড, বিমান দুর্ঘটনা, গোরস্থানে আতঙ্ক, রেসের ঘোড়া, খুন!, স্পেনের জাদুকর, বানরের মুখোশ, ধূসর মেরু, কালো হাত, মূর্তির হুঙ্কার, চিতা নিরুদ্দেশ, অভিনয়, আলোর সংকেত, জিনার সেই দ্বীপ, ঐতিহাসিক দুর্গ, ঝামেলা, কুকুরখেকো ডাইনী, নরকে হাজির, বিড়াল উধাও, ঠগবাজি, যুদ্ধঘোষণা, মারাত্মক ভুল, মঞ্চভীতি, খেলার নেশা, বিষের ভয়, দীঘির দানো, উল্কি রহস্য, নকশা, ডাকাতের পিছে, মৃত্যুঘড়ি, জলদস্যুর মোহর, শয়তানের থাবা, গুপ্তচর শিকারি, পতঙ্গ ব্যবসা, পুরানো কামান, টাকার খেলা, জাল নোট, মাকড়সা মানব, গেল কোথায়, ওকিমুরো কর্পোরেশন, বিষাক্ত অর্কিড, অপারেশন কঙ্কবাজার, মায়া নেকড়ে, প্রেতাত্মার প্রতিশোধ, ভয়ঙ্কর অসহায়, সোনার খোঁজে, তুষার বন্দি, বিপজ্জনক খেলা, রাতের আঁধারে, প্রেতের ছায়া, আরেক ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন, মায়াজাল, রাত্রি ভয়ঙ্কর, গোপন ফর্মূলা, সৈকতে সাবধান, ভ্যাম্পায়ারের দ্বীপ, খেপা কিশোর, দ্বীপের মালিক, কিশোর জাদুকর, তিন বিঘা দক্ষিণ যাত্রা, গ্রেট রবিনিয়োসো, গ্রেট কিশোরিয়োসো , গ্রেট মুসাইয়োসো, নিখোঁজ সংবাদ, চাঁদের ছায়া, অপারেশন অ্যালিগেটর, প্রত্নসন্ধান, দুর্গম কারাগার, মানুষ ছিনতাই, নিষিদ্ধ এলাকা, সময়-সুড়ঙ্গ।

অ্যাডভেঞ্চার সিরিজ:

ষড়যন্ত্র ১ ও ২, অনুসন্ধান, কালকুক্ষি, আমি টাইগার বলছি, মাকড়সার জাল।

রোমহর্ষক সিরিজ:

যাও এখান থেকে, বিষধর, নরবলি, পাগলাঘণ্টী, চরমপত্র, অপারেশন বারমুডা ট্রায়াঙ্গল, পলাতক, নিরুদ্দেশ, অভিশপ্ত ছুরি, নরখাদকের দেশে, শ্বেতহস্তী।

গোয়েন্দা রাজু সিরিজ:

মামার মন খারাপ, সাবাস!, বিরোধী দল, দামী কুকুর, হিপ হিপ হুররে, চকলেট কোম্পানী, নতুন হেডকোয়ার্টার, সার্কাস, খেলনা বিমান ও সোনার মেডেল, সুরের নেশা ও আজব ভূত, আজব রশ্মি, জাহাজ চুরি, নকশা পাচার, টাকের ওষুধ।

কিশোর হরর সিরিজ:

অতৃপ্ত প্রেতাত্মা, বৃক্ষমানব, অভিশপ্ত ক্যামেরা, জীবন্ত মমি, তান্ত্রিকের কবলে, পাশের বাড়ির ভূত, অদৃশ্য বন্ধু, জাদুর ঘড়ি, অলৌকিক শক্তি, নেকড়েমানব, পিরামিডের আতঙ্ক, আয়নার ওপাশে, জল্লাদের হাসি, সাগর বিভীষিকা, সেই অভিশপ্ত ক্যামেরা, ভুতুড়ে সৈকত, ভয়ানক দুঃস্বপ্ন, রাত্রি যখন গভীর, অগ্নিপরীক্ষা, বিপদের মুখোমুখি, আতঙ্কের রাত, ঘুমালে বিপদ, আরেক পৃথিবী, ড্রাকুলার নিঃশ্বাস, বেড়ালের কান্না, মমির অভিশাপ, বিপজ্জনক বর্ম, ডাইনীর চোখ।

এক

'হঠাৎ করেই, প্রায় অলৌকিক ভাবে ক্ষমতাটা পেয়ে গেছি আমি,' রিটা গোল্ডবার্গ বলল। 'কিভাবে পেয়েছি, জানতে চাও?'

'চাই,' বলে মুসা আর জিনার দিকে তাকাল রবিন।

নীরবে মাথা ঝাঁকাল মুসা।

জিনা বলল, 'বলো।'

'একেবারে গোড়া থেকে?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'আমরা অনেক চিন্তা-ভাবনা আলাপ-আলোচনা করে একমত হলাম, কিশোরের ব্যাপারে কেউ যদি কোন সূত্র দিতে পারে, সে তুমি। ওকে খুঁজে বের করতে হলে সব তথ্য আমাদের জানা দরকার। কিছুই মিস করা চলবে না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তোমার এই ক্ষমতা পাওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে কিশোরকে উদ্ধারের পথ।'

'ঠিক আছে, বসো তোমরা,' বলে লিভিং-রুম থেকে উঠে চলে গেল রিটা। ফিরে এল কয়েক মিনিটের মধ্যে। বড় একটা বাঁধানো খাতা নিয়ে এসেছে হাতে করে। রবিনের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নিয়ে যাও এটা। আমার স্পেশাল ডায়েরী। পড়লে সব জানতে পারবে। আগে পড়ে নাও, তারপর কিভাবে তোমাদের সাহায্য করা যায়, আলোচনা করব। পড়ে তাড়াতাড়ি ফেরত দিও।'

'দেব,' সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে ডায়েরীটা নিল রবিন।

'তোমরা তিনজন ছাড়া আর কেউ যেন ডায়েরীটা পড়তে না পারে,' সাবধান করে দিল রিটা।

'চোখেও দেখবে না কেউ,' রবিন বলল। 'বড় খাম আছে তোমার কাছে?'

'আছে।'

রিটার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মুসা আর জিনাকে নিয়ে বাড়ি চলে এল রবিন। মা-বাবা বাড়ি নেই, কাজে বেরিয়েছেন। নিরাপদে ডায়েরী পড়তে কোন অসুবিধে হবে না।

লিভিং-রূমে ঢুকেই মুসা বলল, 'মেরিআন্টির একটা খবর নেয়া দরকার।'

ফোন করল সে। রাশেদ পাশা ধরলেন।

কয়েক মিনিট কথা বলে রিসিভার রেখে দিয়ে ফিরে তাকাল মুসা, 'আন্টি এখনও বিছানায়। আঙ্কেলের মনমেজাজও ভাল না। ব্যবসা, কাজে-কর্মে মন নেই।'

'থাকার কথাও নয়,' জিনা বলল। 'কিশোরের খোঁজ না পেলে কোনদিনই আর ভাল হবেন না আন্টি...'

বাধা দিয়ে রবিন বলল, 'কথা আর না বাড়িয়ে কাজে লেগে পড়া যাক। ডায়েরীতে কি আছে পড়ছি আমি। তোমরা কাছে এসে বসো।'

ডায়েরীটা খুলল রবিন। সুন্দর হাতের লেখা রিটার। গোটা গোটা অক্ষর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পড়তে কোন অসুবিধা হয় না।

জোরে জোরে পড়তে শুরু করল সে।

*

মহিলাটাকে স্রেফ একটা ডাইনী মনে হলো আমার। তবু সাহস করে সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকালাম। আমার চেয়ে বেশ খানিকটা লম্বা। তাতে কি?–মনকে বোঝালাম। আমার বয়েস কম। ক্ষিপ্রতা বেশি। লড়াই করার জন্যে প্রস্তুত হয়েই এসেছি আমি।

কাবু ওকে করব আমি, তবে হাতাহাতি লড়াইয়ে নয়, কথার মারপ্যাঁচে।

এতদিন ধরে যা শিখে এসেছি, তাতে একটা ব্যাপার আমার কাছে পরিষ্কার, কোন কিছুতে জিততে হলে কিংবা কোন জিনিস পেতে চাইলে একাগ্রভাবে সেটা চাইতে হবে; ইচ্ছে শক্তিটাই হলো আসল।

বাজার করাটা খুব কঠিন কাজ। অন্তত আমার কাছে। রীতিমত যুদ্ধ করা মনে হয়।

চুলের গোড়ায় আঙুল চালিয়ে সাহস সঞ্চয়ের চেষ্টা করলাম। আমার সবচেয়ে সুন্দর হাসিটা তাকে উপহার দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিক্রির জন্যে? আগামী সপ্তায় থাকবে তো?'

ডাইনী মহিলাটা একজন সেলস লেডি। নাম ক্লডিয়া। বুকে ঝোলানো নেম-ট্যাগে সোনালি অক্ষরে লেখা রয়েছে নামটা।

আমার কথায় চোখের একটা পাপড়িও কাঁপাল না। বরং তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে মাথাটাকে পেছনে ঝটকা দিয়ে ছোট্ট একটা হাসি দিল।

এই একটা জিনিস একেবারেই সহ্য করতে পারি না আমি, তাচ্ছিল্য করা।

'বিক্রি?' উপহাসের সুরে বলল, 'এটা সাধারণ ব্লাউজ নয়, খুকী। তুমি চিনতে ভুল করেছ। প্যারিস, লন্ডন, মিলানের সামার কালেকশনে শো করা হয়েছিল। কিনতে হলে প্রচুর টাকা লাগবে। যদি না থাকে, আলোচনা করেও লাভ নেই। কিচ্ছা এখানেই খতম।'

পিত্তি জ্বলে গেল আমার। মাঝে মাঝে ভেবে অবাক লাগে, এ ধরনের চাঁড়ালগুলোকে কোত্থেকে জোগাড় করে দোকান মালিকরা! দুনিয়ার আর কোথাও যেন জায়গা না পেয়ে খুঁজে খুঁজে রকি বীচে এসে হাজির হয় এরা। আজকে আমার জন্মদিন। আর আজই কিনা দেখা হলো এমন একটা জঘন্য চরিত্রের সঙ্গে।

অন্য কোনদিন হলে মহিলার এ কথা শোনার পর আর একটা সেকেন্ডও দাঁড়াতাম না। সোজা ঘুরে হাঁটা দিতাম। কিন্তু আজ

আমি নিজের পয়সায় বাজার করতে আসিনি। তাতে সাহস বেড়ে গেছে।

টান দিয়ে পকেট থেকে বাবার আমেরিকান এক্সপ্রেস প্ল্যাটিনাম কার্ডটা বের করলাম। আমার প্রতি জন্মদিনে কেনাকাটা করতে পাঠানোর সময় হাতে তুলে দেয় এটা বাবা, যাতে ইচ্ছেমত খরচ করতে পারি। মহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কিনতে চাইলে নিশ্চয় পরা যাবে? গায়ে ফিট হলো কিনা বুঝব কি করে?'

আমার দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থেকে মাথাটা সামান্য একটু নোয়াল মহিলা। ঝাঁকি দিতেও ইচ্ছে করছে না। যেন অতি তুচ্ছ একটা জীব আমি।

ওর সামনে থেকে সরার জন্যে বললাম, 'তাহলে চেঞ্জিং রুমটা দেখিয়ে দিন, প্লীজ।'

আমার হাতের প্লাস্টিকের কার্ডটা মনোযোগ দিয়ে দেখল ক্লডিয়া। তারপর কোন কথা না বলে ঘুরে রওনা হয়ে গেল দোকানের পেছন দিকে। কয়েক কদম গিয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'এক সেকেন্ড। আসছি।'

সাধারণত এ ধরনের বড় দোকানগুলোকে আমি এড়িয়েই চলি। কিন্তু ব্লাউজটার ওপর চোখ পড়ে গেছে আমার। সেই মে মাস থেকে উইনডোতে ঝোলানো দেখে আসছি। এটা জুন। এতদিনেও ব্লাউজটা মাথা থেকে দূর করতে পরিনি আমি। কি করে পারব? আমার বয়েসী কোন মেয়েই পারবে না। এত সুন্দর জিনিস! কি তার রঙ: খাঁটি বিদ্যুৎ-নীল। হাতা কাটা। হাতে তৈরি লেস আর সিল্কের সুতোর অলঙ্করণ। একটা অদ্ভুত ব্যাপার–মনে হলো, আগে কোথাও দেখেছি ব্লাউজটা। ছোঁয়ার জন্যে, আপন করে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্যে অস্থির হয়ে উঠলাম।

ক্লডিয়া বলে গেল 'এক সেকেন্ড', কিন্তু ফিরল পুরো পাঁচ মিনিট পর। মুখটাকে গম্ভীর করে রেখে জানাল, 'তোমার জন্যে একটা চেঞ্জিং রুম রেডি করতে দেরি হয়ে গেল। এসো।'

রেডি করেছে মানে! অবাক হলাম। আমি তো জানতাম পোশাকের দোকানে চেঞ্জিং রুম রেডিই থাকে। ও কি আমাকে চোর ভেবেছে? গোপন ক্যামেরা চালু করে রেখে এসেছে?

*

"থাবড়া মেরে দেয়া উচিত ছিল বদমাশ বেটিটার মুখে!" বলে উঠল মুসা। ছেদ পড়ল রবিনের পড়ায়। ডায়েরী থেকে মুখ তুলে তাকাল।

"যা-ই বলো,' মাথা দুলিয়ে বলল জিনা, "রিটা লেখে কিন্তু চমৎকার। ভাষা ভাল। একেবারে ছবি দেখিয়ে দেয়। প্র্যাকটিস রাখলে বড় লেখক হতে পারবে।"

"হুঁ," মাথা ঝাঁকাল রবিন।

"পড়ো, পড়ো, এরপর কি হয়েছে শোনা যাক।"

আবার ডায়েরীর দিকে চোখ নামাল রবিন।

*

চেঞ্জিং রুমে ঢুকে আর একটা মুহূর্তও দেরি করলাম না। ক্যামেরার কথা মাথা থেকে উধাও করে দিয়ে পরে ফেললাম ব্লাউজটা। এমন ভাবে ফিট করল, যেন আমার জন্যেই মাপ দিয়ে বানানো হয়েছে।

আয়নার দিকে তাকালাম। সত্যি, দারুণ মানিয়েছে আমাকে। তবে দামটা অতিরিক্ত। তিনশো ডলার। একটা ব্লাউজের দাম তিনশো, কল্পনা করা যায়! বাবার পকেট থেকে এতগুলো টাকা খসাতে মায়াই লাগল আমার। কিন্তু কোনমতেই লোভ ছাড়তে পারলাম না। আয়নার দিক থেকেও চোখ সরাতে পারলাম না।

একদৃষ্টিতে প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কি যেন কি ঘটে যেতে লাগল আমার ভেতরে। প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলাম। সাংঘাতিক ক্ষমতা তৈরি হচ্ছে যেন আমার মধ্যে। ব্লাউজটা আগে কোথাও দেখেছি–বার বার মনে হচ্ছে এ কথাটা। কোথায়? অন্য কোনও দোকানে? কোনও ফ্যাশন শো'তে?

উঁহু, দোকানে নয় বা কোন স্টলে নয়! ব্লাউজটা যেন আমারই ছিল, আমি নিজেই পরেছি কোন এক সময়! কিন্তু তা কি করে সম্ভব?

যতই মনে করার চেষ্টা করলাম, তীক্ষ্ণ হয়ে উঠতে লাগল স্মৃতি। ক্যামেরায় তোলা ছবির মত ভেসে উঠল মনের পর্দায়। চোখ বুজে মনের চোখে ছবিগুলো দেখার চেষ্টা করলাম।

জোরাল একটা গুঞ্জন কানে এল। মনে হলো ছাতের কাছ থেকে আসছে। অনেক বেড়ে গেল শব্দটা। মাথার ওপর ফ্লোরেসেন্ট লাইটগুলো মিটমিট করতে করতে নিভে গেল।

অন্ধকার!

হঠাৎ থেমে গেল গুঞ্জন। আলো জ্বলে উঠল আবার।

ভয় পেয়ে গেলাম। ছুটে বেরোলাম বদ্ধ ঘরটা থেকে। ক্লডিয়া যেখানে থাকার কথা, সেখানে নেই। তার জায়গায় অন্য এক মহিলা। চুলের ছাঁট থেকে শুরু করে মেকআপ, জুতো সবই সেকেলে। অনেক পুরানো ফ্যাশন। আরও ঘাবড়ে গেলাম। মগজের গোলমাল হয়নি তো আমার!

ক্লডিয়ার চেয়ে কোন দিক দিয়েই ভাল নয় এই মহিলাটিও। নেম-ট্যাগে নাম লেখা: গ্যারেট। শীতল কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'চেঞ্জিং রুমে কি করছিলে?'

'চেঞ্জিং রুমে কি করছিলাম মানে?' আমি অবাক।

'আমি জানতে চাইছি, কি পরছিলে?'

নাহ্, দোকানটার বদনাম না করে আর পারছি না। এখানকার সব কর্মচারীই দেখা যাচ্ছে ক্লডিয়ার মত। ভাল ব্যবহার শেখেইনি। কিছুটা রুক্ষস্বরেই জবাব দিলাম, 'গায়ে যে ব্লাউজটা দেখছেন, এটাই পরছিলাম।'

চারপাশে তাকিয়ে অদ্ভুত সব পরিবর্তন লক্ষ করলাম। কোন কিছুই যেন স্বাভাবিক লাগছে না। ঘটছেটা কি এখানে! কয়েক মিনিট আগে যে ডেকোরেশন দেখে গিয়েছিলাম, সেটা বদলে

গেছে। এত তাড়াতাড়ি কি করে বদলাল?

'দেখো মেয়ে,' ধমকের সুরে বলল গ্যারেট, 'আমার দোকানের মধ্যে কোন রকম গণ্ডগোল চাই না। যাও, বেরোও!'

'কিন্তু...আমি...'

'এক্ষুণি!' আরও জোরে ধমকে উঠল গ্যারেট। 'কি সব পোশাক পরেছে দেখো! বিচ্ছিরি! আমার কাস্টোমাররা তোমাকে দেখে চমকে যাচ্ছে। যাও, যাও, বেরোও!'

এতক্ষণে লক্ষ করলাম, দোকানের সব লোক তাকিয়ে আছে আমার দিকে। যেন আমি একটা চিড়িয়া। হাঁ করে দেখছে।

'যাচ্ছি। তবে একটা কথা, ম্যা'ম,' বলতে ছাড়লাম না, 'ওদের চমকে যদি কেউ দিয়েই থাকে, সেটা আমি না, আপনি।'

'কি বললে?'

'ঠিকই বলেছি। পাগলের চেয়ে ডাইনীকে অনেক বেশি ভয় করে লোকে।'

জবাব আটকে যাওয়ায় মরা মাছের মত হাঁ হয়ে গেল গ্যারেটের মুখ। প্রতিশোধ নিতে পেরে খুশিমনে দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম আমি।

*

পথে বেরিয়ে হতবাক। কয়েক মিনিটের মধ্যে পুরো শহরটাই কেমন পাল্টে গেছে। মানুষজন, জিনিসপত্র, সব কিছু এক লাফে যেন ফিরে গেছে তেরো বছর আগে। কি বিচ্ছিরি সব পোশাক পরেছে লোকে। প্যান্ট, জুতো! আহা, কি ছিরি! ওয়াক! বমি আসে দেখলে! আর একটা ব্যাপার, সবাই শীতের পোশাক পরেছে।

সন্দেহ হলো। একটা দোকানে ক্যালেন্ডার ঝোলানো দেখে সেদিকে এগোলাম। স্তব্ধ হয়ে গেলাম। ১৯৮৭-র শীতকাল। এক লাফে এক যুগের বেশি পেছনে চলে এসেছি। অবিশ্বাস্য! এ কি করে সম্ভব!

বোকার মত তাকিয়ে রইলাম রাস্তার লোকজনের দিকে।

ওরাও তাকাতে লাগল আমার দিকে। যেন আমি একটা কি!–পাগলা গারদ থেকে এইমাত্র ছাড়া পেলাম। গরমকালের পোশাক পরে আছি আমি। প্রচণ্ড উত্তেজনায় শীতও টের পাচ্ছি না।

মনে হলো, সব রহস্যের জবাব রয়েছে ওই চেঞ্জিং রুমটায়। পায়ে পায়ে আবার মলের দিকে ফিরে চললাম।

মলে ঢুকে এলিভেটরের দিকে এগোনোর সময় দেখলাম, গরম কাপড় পরে ভালুক সেজে যাওয়া একটা ছেলে দোকানের বিজ্ঞাপন করছে। হাতে একগাদা কাগজ। আমার দিকে একটা কাগজ বাড়িয়ে দিতে গিয়ে থমকে গেল। কুঁচকে গেল ভুরু। ভাবল বোধহয়, আমি তার প্রতিদ্বন্দ্বী। আজব পোশাক পরে তার জায়গা দখল করতে এসেছি।

ভুল ভাঙানোর চেষ্টা করলাম না। তার হাত থেকে ছোঁ মেরে একটা কাগজ কেড়ে নিয়ে, একটা মুচকি হাসি উপহার দিয়ে সরে এলাম।

এলিভেটরে উঠলাম। আমি একা। দরজা বন্ধ হতে শুরু করল। ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখলাম, এখনও একই ভঙ্গিতে তাকিয়ে আছে ছেলেটা।

কাগজটার পেছনে পেন্সিলে লেখা রয়েছে কি যেন। দাগ পড়ে গেছে। উল্টে দেখলাম, একটা ফোন নম্বর। ছেলেটারই হবে হয়তো।

দরজাটা পুরো লেগে যাবার পর মাথার ওপরের গুঞ্জনটা কানে এল। আলো মিটমিট করতে লাগল এলিভেটরের। নিভে গেল।

বিদ্যুৎ চলে গেল নাকি! ঘাবড়ে গিয়ে অ্যালার্ম বেলের বোতামটা টিপতে যাব, ফিরে এল আলো। মুহূর্ত পরেই দরজা খুলে গেল। তিনতলার মেঝেতে পা রাখলাম আমি।

বেরিয়ে এসে চারপাশে তাকালাম।

আবার সেই পরিচিত দৃশ্য। আমার পরিচিত পরিবেশ।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

শিওর, আমি অতীতে চলে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেছি বর্তমানে। সত্যি কি এসেছি? দোকানটাতে গেলেই বুঝতে পারব।

করিডর ধরে প্রায় দৌড়ে চললাম পোশাকের দোকানটার দিকে। ব্লাউজটা যেখানে ছিল। কিন্তু দুই কদমও এগোতে পারলাম না। সামনে এসে দাঁড়াল দুজন গার্ড।

'এই মেয়েটাই,' বলল একজন।

খপ করে আমার হাত চেপে ধরে টান দিল দ্বিতীয় গার্ড, 'এসো আমার সঙ্গে।'

'কোথায়?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

'গেলেই টের পাবে, খুকী!'

'খুকী খুকী করছেন কেন আমাকে!' রেগে উঠলাম। 'আমার বয়েস কি খুব কম মনে হচ্ছে?'

কথার জবাব দিল না ওরা। একজন ওয়াকি-টকি বের করে কারও উদ্দেশ্যে কথা বলল, 'পেয়েছি ওকে। ধরে নিয়ে আসছি...'

*

রবিন এ পর্যন্ত আসতেই বাধা দিয়ে মুসা বলে উঠল, "দেখো, ভাই, আমার মাথা গরম হয়ে যাচ্ছে! গলা শুকিয়ে গেছে! কোক-টোক কিছু যদি থাকে, এনে দাও জলদি! খেলে হয়তো সহ্য করতে পারব।...বাপরে বাপ, কি কাণ্ড!"

"হ্যাঁ, অবাক হওয়ার মতই ঘটনা!" বিড়বিড় করল জিনা।

"আমি কিন্তু অবাক হচ্ছি না," ডায়েরীটা খোলা অবস্থায়ই সোফায় উপুড় করে রাখল রবিন। "সেদিন লেকের পাড়ে ইউ এফ ও'টা দেখার পর থেকে অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছি। কোন কথাই আর অবিশ্বাস করব না। চোখের সামনেই তো তুলে নিয়ে গেল ওরা কিশোরকে।"

উঠে রান্নাঘরে চলে গেল রবিন। আভন থেকে বের করা গরম বার্গার, আর ফ্রিজ থেকে কোক নিয়ে ফিরে এল। সামনের টেবিলে রেখে মুসার দিকে তাকাল, "খাও।"

একটা বার্গার তুলে নিল জিনা। গেলাসে কোক ঢালল।

ডায়েরীতে কি লেখা আছে জানার জন্যে অস্থির হয়ে গেছে ওরা। তাড়াতাড়ি গপগপ করে গিলে নিয়ে খাওয়া শেষ করল।

ডায়েরীটা আবার তুলে নিল রবিন।

মুসার দিকে তাকাল জিনা। "পড়ার সময় আর বাধা দেবে না, বুঝলে! তাড়াতাড়ি পড়া শেষ করতে না পারলে রিটার সঙ্গে আলোচনায়ও বসা যাবে না। যত জলদি সম্ভব, খুঁজে বের করতে হবে কিশোরকে।'

"কিন্তু কোথায় আছে কিশোর?" মুসার প্রশ্ন।

"কাচু-পিকচুতে!" জানা থাকলে, জবাব দিতে পারত জিনা।

দুই

ভারী লাগামটা খচ্চরের পিঠের ওপর দিয়ে টেনে এনে শপাং করে বাড়ি মারল কিশোর।

'হাঁট্, শয়তান কোথাকার!' রাগে চিৎকার করে উঠল সে। লাঙলের হাতল ধরে ঠেলা দিল জোরে। মাথা ঘুরিয়ে খচ্চরটাকে চোখে চোখে তাকাতে দেখে রাগ আরও বেড়ে গেল।

'হাঁট্! টান দে!' আরও জোরে খচ্চরের পিঠে বাড়ি মারল সে।

আস্তে এক পা বাড়াল জানোয়ারটা। তারপর আরেক পা।

পিছে পিছে হাঁটতে থাকল কিশোর। লাঙল ঠেলতে ঠেলতে ব্যথা হয়ে গেছে হাত। কাঁধ পোড়াচ্ছে চড়া রোদ। সকালটা অর্ধেক শেষ। সূর্যোদয় থেকে পরিশ্রম করে এতক্ষণে মাত্র দুটো ফালি চাষ দিতে পেরেছে।

এ ভাবে চললে খামারটা খোয়াতে হবে। ভাবনাটা শঙ্কা জাগাল মনে। এই খামারে জন্মায়নি সে। বাপ-দাদা চোদ্দ পুরুষে কখনও হালচাষ করেনি। কিন্তু তাকে করতে হচ্ছে, পরিস্থিতির কারণে বাধ্য হয়ে।

পিঠ বেয়ে দরদর করে নামছে ঘাম। শার্টের হাতা দিয়ে ভুরুর ঘাম মুছল। এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি বা লেমোনেড পেলে খসখসে গলাটা ভেজানো যেত।

কিন্তু থামার সময় নেই। এগিয়ে যেতে হবে। খেতের শেষ প্রান্তের দিকে তাকাল। ভুলে থাকতে চাইল পানির কথা।

থেমে গেল আবার খচ্চরটা। টানতে চাইছে না আর। থুতনি বুকের কাছে নেমে এল কিশোরের। জানোয়ারটাকে সামলাতে গিয়ে পরিশ্রম যা হচ্ছে, তার চেয়ে নিজে টানলেও বোধহয় কষ্ট কম হত।

মাথার দোমড়ানো বাদামী হ্যাটটা খুলে নিয়ে রাগ করে মাটিতে আছড়ে ফেলল সে। গরম বাতাসে উড়িয়ে এনে মুখের ওপর ফেলতে লাগল বহুদিনের না কাটা লম্বা, কোঁকড়া চুলগুলো। সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে দু'হাত পেছনে এনে কোমরে চাপ দিল। আগুনের মত পুড়িয়ে দিল যেন তীব্র ব্যথা। যতই দিন যাচ্ছে, পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে আরও। ফোঁস করে বেরিয়ে এল দীর্ঘশ্বাস। আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করল, 'মিস্টার হার্ট, খচ্চরটাকে একটু হাঁটতে বলুন, প্লীজ!...আপনি বললেই ও হাঁটবে। আপনার কথা শোনে। আমাকে পাত্তাই দেয় না।'

বাড়ির দিকে তাকাল কিশোর। বিশাল ওক গাছটার নিচের কবর ফলক দুটো এখান থেকেও দেখা যায়। রোদের মধ্যেও গায়ে কাঁটা দিল তার। ইনডিয়ান দম্পতির মৃত্যুটা এখনও তার কাছে রহস্যময়।

নিজের অজান্তেই বুজে এল চোখের পাতা। সিসি আর হেনরিকে দেখতে পেল কল্পনায়। আবার চোখ মেলল। বিশাল

বাড়িটাতে ওই দুটো ছেলেমেয়েকে নিয়ে একা থাকতে হয় তাকে।

কানে বাজতে লাগল লং জন হার্টের যন্ত্রণাকাতর কণ্ঠ: ছেলেমেয়ে দুটোকে তুমি দেখো, কিশোর! তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম ওদের!

যে বিকেলে মারা গেছেন হার্ট আর তাঁর স্ত্রী কোরিনা, সেই বিকেলটা এখনও জ্বলজ্বলে তার স্মৃতিতে। ধূসর মেঘ জমেছিল আকাশে। ঠাণ্ডা বাতাসে ভেসে আসছিল বৃষ্টির গন্ধ। কাঠের দোতলা বাড়িটার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল সে। তাকিয়ে দেখছিল, স্ত্রীকে ওয়্যাগনে উঠতে সাহায্য করছেন হার্ট। দূরের এক আত্মীয় বাড়িতে একটা অনুষ্ঠানে যাবেন।

ওয়্যাগনে বসে মাথার টুপিটার ফিতে বেঁধেছেন কোরিনা। ফিরে তাকিয়েছেন কিশোরের দিকে, 'বাবা, ছেলেমেয়ে দুটোকে দেখো। পারবে না?'

মাথা ঝাঁকিয়েছে কিশোর।

সিসি আর হেনরিকে বলেছেন কোরিনা, 'তোমাদের কিশোর ভাইয়ের কথা শুনবে তোমরা। কি, বুঝতে পেরেছ? নইলে কিন্তু আমরা ফিরে আসার পর কোন উপহার পাবে না।'

মুখ গোমড়া করে সামান্য মাথা ঝাঁকিয়েছে সিসি। হেনরি কোন কথা বলেনি। ভ্রূকুটি করে আপনমনে ছেঁড়া একটা কাপড়ের তৈরি খেলনা ক্রমাগত ঘুরিয়েছে ছোট ছোট আঙুলে। গাল ফুলিয়ে আদুরে কণ্ঠে অনুরোধ করেছে, 'আমরাও তোমাদের সঙ্গে যাব, কোরিআন্টি।'

'হেনরি, তোমাকে সিসি আর কিশোরের সঙ্গে এখানেই থাকতে হবে,' কঠোর হয়েছেন কোরিনা। 'লক্ষ্মী ছেলের মত থাকো। আসার সময় তোমাদের জন্যে অনেক কিছু নিয়ে আসব আমরা।'

'অনেক কিছু তো চাই না আমরা,' হিসিয়ে উঠেছে সিসি। 'আমরা তোমাদের সঙ্গে যেতে চাই।'

সিসি আর হেনরির কাঁধে হাত রেখেছে কিশোর। 'থাক, যাবার দরকার নেই। নিতে যখন চাইছেন না কোরিআন্টি, নিশ্চয় কোন কারণ আছে। এখানেই থাকো তোমরা, আমার সঙ্গে। আমাকে খারাপ লাগে?'

জোরে জোরে মাথা নেড়েছে হেনরি আর সিসি।

'না না, তোমাকে খুব ভাল লাগে আমাদের, কিশোরভাই,' সিসি বলেছে। 'তোমাকে নিয়ে আমরা সবাই যদি আন্টিদের সঙ্গে যেতে পারতাম, আরও ভাল লাগত।'

সকাল থেকেই কোরিনার পিছে লেগে থেকেছে দুই ভাই-বোন। কতভাবে অনুরোধ করেছে সঙ্গে নেয়ার জন্যে। কান্নাকাটি করেছে। কিন্তু আন্টি অটল। কোনমতেই রাজি হননি। কিশোর বুঝেছে, বাধা না থাকলে সিসি আর হেনরিকে সঙ্গে না নিয়ে যেতেন না। ওদের বাবা-মা নেই। কোথায় আছে–মারা গেছেন না বেঁচে আছেন, সেটাও আরেক রহস্য। এ ব্যাপারে প্রশ্ন করেও কোন জবাব বের করতে পারেনি কিশোর। হার্টদের সঙ্গে সিসি বা হেনরির রক্তের সম্পর্ক নেই। কিন্তু বাবা-মায়ের অবর্তমানে বাবা-মা'র মতই স্নেহ দিয়ে দুজনকে বড় করতে চেয়েছেন ওই ইনডিয়ান দম্পতি। সুতরাং নেননি যখন, বোঝাই গেছে–সঙ্গে নেয়ার উপায় ছিল না।

সিসির বয়েস তেরো। হেনরির ছয়। কিশোরের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে এমন করে গিয়ে সিঁড়িতে গা ঘেঁষাঘেঁষি করে বসেছিল দুজনে, মায়াই লাগছিল কিশোরের। দুজনেরই কালো চুল। দুজনেরই কান্নাভেজা সবুজ চোখের তারায় জ্বলছিল রাগের আগুন।

'নিশ্চিন্তে চলে যান আপনারা,' হেসে বলেছে কিশোর। 'সিসি আর হেনরি ঠিকমতই ঘরের কাজ করবে, সকাল সকাল ঘুমাতে যাবে...'

তার দিকে তাকিয়ে জিভ বের করে ভেঙচি কেটেছে সিসি

হেসেছে কিশোর।

ঘোড়ায় টানা ওয়্যাগনে সামনের বেঞ্চসীটে উঠে বসেছিলেন হার্ট। চাকার ব্রেক ছেড়ে কিশোরের দিকে ফিরে বলেছেন, 'শনিবার নাগাদ ফিরব।'

ঘোড়া চালানোর জন্যে চাবুক মারার দরকার পড়ত না হার্টের। লাগাম তুলে সামান্য টান দিতেই কোন রকম প্রতিবাদ না করে চলতে শুরু করেছে চারটে ঘোড়া।

ওঁদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়েছে কিশোর। সিসি আর হেনরিকে নাড়তে বলেছে।

'না, নাড়ব না!' রাগ করে হাত দুটো কোলের কাছে গুটিয়ে নিয়েছে সিসি।

'নাড়ব না!' বোনের দেখাদেখি হেনরিও একই ভাবে হাত গুটিয়ে নিয়েছে।

'আমি ওদের সঙ্গে যেতে চেয়েছিলাম,' সিসি বলেছে, 'নিল না!' রাগ করে পা ঠুকল সিঁড়িতে।

'নিল না!' দেখাদেখি হেনরিও পা ঠুকেছে।

হঠাৎ, আকাশের বুক চিরে দিয়ে গেল বিদ্যুৎ-শিখা। শোনা গেল বজ্রের চাপা গুড়ুগুড়ু শব্দ। কিশোরের মনে হচ্ছিল পায়ের নিচের মাটি কাঁপছে। তীব্র গতিতে পিঠে ঝাপটা দিচ্ছিল বরফের মত শীতল ঝোড়ো হাওয়া।

ঘোড়াগুলোর আর্তচিৎকার কানে আসতে আকাশের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকিয়েছে কিশোর। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে চারটে ঘোড়াই। খুর দিয়ে বাতাস খামচে ধরতে চাইছিল যেন। পরক্ষণেই মাটিতে পা নামিয়ে পাগলের মত লাফ মেরেছে সামনের দিকে।

মরিয়া হয়ে লাগাম টেনে ওগুলোকে সামলানোর চেষ্টা করেছেন হার্ট। চিৎকার করে ডেকে ডেকে শান্ত করতে চেয়েছেন।

লাফ দিয়ে বারান্দা থেকে ছুটে গেছে আতঙ্কিত কিশোর।

চিৎকার করে ঘোড়াগুলোকে থামতে বলেছে। কিন্তু বিফল হয়ে বাতাসে ভেসে গেছে তার ডাক। হার্টই যেখানে থামাতে পারেননি, সে থামাবে কি?

টানতে টানতে গভীর খাদের দিকে ওয়্যাগনটাকে নিয়ে গেছে ঘোড়াগুলো। পড়লে নিজেরাও যে মরবে সে-খেয়াল ছিল না। টান সামলাতে না পেরে, ঝাঁকুনি লেগে চিত হয়ে পেছনে উল্টে পড়ে গিয়েছিলেন হার্ট। ওয়্যাগনের ধার আঁকড়ে ধরেছিলেন কোরিনা। হ্যাঁচকা টানে মাথার টুপিটা উড়িয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিল বাতাস, ফিতে বাঁধা থাকায় পারেনি, ফাঁসের মত গলায় টান দিচ্ছিল সেই ফিতে। বাতাসে উড়ছিল লম্বা চুল।

কোনমতেই থামানো যায়নি ঘোড়াগুলোকে। সোজা ধেয়ে গিয়েছিল খাদের দিকে। ডিগবাজি খেয়ে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল পাড়ের ওপাশে।

অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে হয়েছে কিশোরকে। সাহায্য করার কোন সুযোগ ছিল না।

তিন

দুর্ঘটনাটা নিয়ে অনেক ভেবেছে কিশোর। হাজার ভেবেও কোন কূলকিনারা পায়নি। কেন এমন অদ্ভুত আচরণ করল ঘোড়াগুলো? বিদ্যুৎ চমকাতে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল? নাকি বজ্রের শব্দে ভয় পেয়েছিল?

সূত্র খুঁজে বেড়িয়েছে কিশোর ভাঙা গাড়িটায়, খাদের ওপরে, খাদের নিচে। কিছুতেই বুঝতে পারেনি, ঘোড়াগুলোর ওভাবে

হঠাৎ খেপে যাওয়ার কারণ। রহস্যটা এখনও অমীমাংসিত।

সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপারটা হলো, কোন প্রাণীর ওপর হার্টকে এ ভাবে নিয়ন্ত্রণ হারাতে আর দেখেনি সে। বরং উল্টোটাই দেখেছে। সব জানোয়ার তাঁর কথা শুনত। গৃহপালিত তো বটেই, বনের জানোয়ারও তাঁর কথা অমান্য করত না। করত যে না, সেটা তো কিশোর নিজের চোখেই দেখেছে। জানোয়ারে কথা না শুনলে আজ সে এখানে থাকত না, কোন্‌দিন ওদের খাবার হয়ে মাটির সঙ্গে মিশে যেত।

মনে পড়ল রকি বীচের সেই দিনটির কথা। ভুল তারিখে তার জন্মদিন করে ফেলেছিলেন মেরিচাচী। ভুলটা যে কি করে করলেন তিনি, সেটাও এক রহস্য। আর যারই হোক, কিশোরের জন্মদিনের তারিখ নিয়ে অন্তত মেরিচাচীর ভুল হওয়ার কথা ছিল না। রহস্যটা ভেদের সুযোগই পায়নি কিশোর।

জন্মদিনে নতুন ক্যামেরা উপহার পেয়েছিল সে। সেই ক্যামেরা নিয়ে লেকের পাড়ের বনে ইউ.এফ. ও'র ছবি তুলতে গিয়েছিল। আকাশে বিচিত্র মেঘ দেখেছিল। দেখেছিল রঙিন ফানেল। তারপর অন্ধকার। অন্ধকার কেটে গেলে শুরু হলো দুঃস্বপ্ন···মস্ত এক কাঁচের পাইপে ভরে রাখা হয়েছে তাকে···পালাল সে ওটার ভেতর থেকে···বিশাল ল্যাবরেটরির মধ্যে দিয়ে ছুটল···বেরোতে পারল না, ধরে ফেলা হলো তাকে···আবার পালাল···আবার ধরা পড়া···আবার পালানো···আবার ধরা···শেষে নেতা গোছের লোকটা মহাখাপ্পা হয়ে তার সহকারীদের বলল—ভয়ঙ্কর ছেলে; একে এখানে রাখা যাবে না। এমন কোথাও রেখে এসো, যেখানে মুক্তও থাকবে আবার বন্দিও থাকবে, আমাদের খপ্পর থেকে কোনমতেই বেরিয়ে যেতে পারবে না···লোকটার মুখে ডাক্তারদের মাস্ক ছিল, চেহারা বোঝা যাচ্ছিল না, কিন্তু কণ্ঠস্বরটা চেনা চেনা—কোথায় শুনেছে ওই কণ্ঠ, স্বপ্নের মধ্যে মনে করতে পারেনি কিশোর···

তারপর আর কিছু মনে নেই। হুঁশ ফিরলে দেখল, একটা

বনের মধ্যে পড়ে আছে সে। অন্ধকার হয়ে গেছে তখন। নানা রকম বুনো জানোয়ারের ডাক কানে আসতে লাগল। হঠাৎ দেখল, মাত্র কয়েক গজ দূরে দাঁড়িয়ে লাল চোখ মেলে তাকে দেখছে একটা বিশাল নেকড়ে। হাঁ করা মুখ থেকে ঝুলছে টকটকে লাল জিভ। অসংখ্য ধারাল দাঁত যেন তাকে ছিঁড়ে খেতে প্রস্তুত।

এটাও কি আরেক দুঃস্বপ্ন? নিজের বাহুতে চিমটি কেটেছে কিশোর। ব্যথা পায়নি। না, স্বপ্ন নয়, ভয়ঙ্কর বাস্তব।

লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। দৌড় দিতে গিয়ে লক্ষ করল, একটা নয়, একপাল নেকড়ে ঘিরে ফেলেছে তাকে। গাছে ওঠারও সময় পাবে না সে। ছুটে এসে টুকরো টুকরো করে ফেলবে নেকড়েরা।

তারমানে নিশ্চিত মৃত্যু। চোখ বুজে অপেক্ষা করতে লাগল কিশোর, ধারাল দাঁতগুলো কখন তার গায়ে বেঁধে!

বিঁধল না। কানে এল মানুষের ফিসফিসে চাপা কণ্ঠ। চোখ মেলে দেখল অবিশ্বাস্য দৃশ্য। একজন মানুষ। ইনডিয়ান। পরনে শুধু প্যান্ট। গায়ে কিছু নেই। লম্বা লম্বা চুল। কথা বলছেন নেকড়েগুলোর সঙ্গে। পোষা কুকুরের মত তাঁর পায়ের কাছে লুটোপুটি খেতে শুরু করেছে নেকড়েগুলো। এ যেন আরেক টারজান!

কিশোরকে উদ্ধার করে বাড়ি নিয়ে এলেন হার্ট। আরও চমক অপেক্ষা করছিল কিশোরের জন্যে। হতবাক হয়ে গেল, যখন জানতে পারল দক্ষিণ আমেরিকায় রয়েছে সে। অ্যান্ডিজের পার্বত্য অঞ্চলে পাহাড় ঘেরা একটা অতি দুর্গম শহর—কাচু-পিকচুতে।

বোকা হয়ে গিয়েছিল। এখানে এল কি করে সে? ইউ এফ ও তো নিয়ে যায় ভিনগ্রহে। পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়ার কথা নয়!

তাকে পাগল ভাববে মনে করে হার্টকে সত্যি কথাটা বলল না। বলল, দুনিয়ায় তার কোন আত্মীয়-স্বজন নেই। ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়েছে। বানিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার একটা শহরের

নাম বলে দিল।

সেই থেকেই এ বাড়িতে আছে কিশোর। গত কয়েক মাসে বেশ কয়েকবার গেছে সেই বনে, যেখানে নেকড়ের কবলে পড়ে মরতে বসেছিল। বহু খোঁজাখুঁজি করেছে, সূত্র খুঁজেছে। এক জায়গায় মাটিতে বসে যাওয়া ছয়টা ছোট ছোট বিচিত্র গর্ত ছাড়া আর কিছু চোখে পড়েনি। মনে হয়েছে, ভারী কিছুর পায়ের চাপে তৈরি হয়েছে গর্তগুলো···

জানোয়ার বশ করার ক্ষমতাটা হার্টের কাছ থেকে রপ্ত করেছে সিসি। হাতে ধরে তাকে শিখিয়েছেন হার্ট। চেষ্টা করলে হয়তো কিশোরও শিখে নিতে পারত। কিন্তু কে জানত এমন বিপদে পড়বে! না শিখে এখন আফসোস হচ্ছে। বিদ্যেটা জানা থাকলে পাজি, কর্মবিমুখ, বেয়াড়া খচ্চরটাকে কাজ করাতে অসুবিধে হত না এখন। এটাকে দিয়েই তো দিব্যি হাল টানাতেন লং হার্ট, কোনই সমস্যা হত না। জানোয়ারটা কথা শুনত তাঁর···

বাস্তবে ফিরে এল আবার কিশোরের মন। চারপাশে ছড়ানো জমিটার দিকে তাকিয়ে হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়তে লাগল। সন্দেহ হচ্ছে, কোনদিনই হাল দিয়ে শেষ করতে পারবে না। ফসল বোনা তো দূরের কথা।

কি করবে, বুঝে উঠতে পারছে না। খামারটা বাঁচানোর কোন উপায়ই মাথায় ঢুকছে না। নেকড়ের কবল থেকে বাঁচিয়ে এনে বাড়িতে জায়গা দেয়ায় হার্টের কাছে কৃতজ্ঞ সে। মৃত্যুকালে তাঁকে কথা দিয়েছে, সিসি আর হেনরিকে দেখবে। কথা যদি না-ও দিত, তাহলেও অসহায় ছেলেমেয়ে দুটোকে বাড়িতে একলা ফেলে চলে যেতে পারত না সে। যাওয়াটাও মুখের কথা নয়। যেখানে রয়েছে, সেখান থেকে বেরোতে হলে প্রচুর টাকা দরকার। তার কাছে আছে মোটে বিশ হাজার চিলিয়ান পেসো, আমেরিকান ডলারে এর মূল্যমান পঞ্চাশ ডলারেরও কম। বাড়ির আলমারিতে সামান্য যা ফেলে গিয়েছিলেন হার্ট, তার অবশিষ্ট। এত কম টাকা দিয়ে

কোনমতেই বড় শহরে পৌঁছতে পারবে না তিনজনে। তারপর আরও ঝামেলা আছে। রকি বীচে ফিরতে হলে পাসপোর্ট দরকার। সে-সব জোগাড় করতেও অনেক কাঠখড় পোড়াতে হবে। কিভাবে এসেছে এখানে, বোঝাতে হবে কর্তৃপক্ষকে। সব কিছুর জন্যেই মোটা টাকা প্রয়োজন।

মিস্টার গ্যারিবাল্ডের কথা ভাবল। এখানকার ব্যাংকের প্রেসিডেন্ট। গতকাল এসেছিল দেখা করতে। বলা ভাল, ধমকাতে।

লোকটার কথা মনে হতেই ভয় আর রাগ একসঙ্গে মাথাচাড়া দিল মনে। হুমকি দিয়ে গেছে, সময় মত কিস্তি শোধ করতে না পারলে বাড়িঘর সব দখল করে নেবে। ওই চামারটার কাছ থেকে জমিটা ইজারা নিয়েছিলেন হার্ট। বাড়িঘর হাতছাড়া হলে নিজের ব্যবস্থা নাহয় একটা করে নিতে পারবে কিশোর, কিন্তু পথে বসবে সিসি আর হেনরি। কি হবে ওদের?

মনকে শক্ত করল সে। এখন টাকা জোগাড়ের একটাই উপায়, ফসল ফলানো। খচ্চরের পিঠে আবার বাড়ি মারল লাগাম দিয়ে। 'হাঁট্, ব্যাটা, খচ্চরের বাচ্চা! তোর জন্যে সারাদিন খেতে পড়ে থাকব নাকি?'

বাড়ি খেয়ে চিৎকার করে উঠল জানোয়ারটা। এক পা আগে বাড়াল।

'হ্যাঁ, থামবি না,' সাবধান করল কিশোর। লাঙলের হাতলে শক্ত হলো আঙুল। ফালের খোঁচায় কেটে দুদিকে উল্টে পড়তে শুরু করল আবার কালো মাটি।

দেহের প্রতিটি পেশি টানটান হয়ে ছিঁড়ে পড়তে চাইছে। কিন্তু পরোয়া করল না আর কিশোর।

ডাক শুনে ফিরে তাকাল সে। দৌড়ে আসতে দেখল সিসিকে। কাঁধে নাচছে কালো বেণী। পেছন পেছন আসছে হেনরি।

মোচড় দিয়ে উঠল কিশোরের পেট। দৌড়ানোর ভঙ্গিটা ভাল

লাগল না তার। খারাপ কিছু ঘটল নাকি!

লাঙলের হাতল ছেড়ে দিয়ে ওদের দিকে দৌড় দিল সে। চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, সিসি? কি ব্যাপার?'

দাঁড়িয়ে গেল সিসি। হাসল। 'না না, কিশোরভাই, ভয় পেয়ো না। খারাপ কিছু হয়নি।'

দাঁড়িয়ে গেল কিশোর। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। 'তাহলে ওরকম চিৎকার করছিলে কেন?'

ঝিক করে উঠল সিসির সবুজ চোখের তারা। 'আমাদের শহরে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল না আজ তোমার, মনে নেই?'

'সরি, সিসি, আজ পারব না। অনেক কাজ পড়ে আছে,' খেতের দিকে হাত তুলে দেখাল কিশোর।

কালো হয়ে গেল সিসির সবুজ চোখের তারা। উধাও হয়ে গেছে হাসি। মুখ নিচু করে বলল, 'কিন্তু তুমি আমাদের নিয়ে যাবে কথা দিয়েছিলে!'

'দিয়েছিলাম। কিন্তু...'

প্যান্ট খামচে ধরে টান দিল হেনরি। মুখ তুলে তাকাল কিশোরের দিকে। চোখে টলমল করছে পানি। সবুজ দৃষ্টিতে কাতর অনুনয়।

'তুমিও শহরে যেতে চাও?'

নীরবে মাথা ঝাঁকাল হেনরি। হার্ট দম্পতি মারা যাওয়ার পর থেকে কোন কথা বলে না সে। প্রচণ্ড শক্ পেয়েছে বোধহয়। কথা বন্ধ হয়ে গেছে।

মাটিতে বসে পড়ল কিশোর। টোকা দিয়ে একটা লাল রঙের গুবরে পোকা ফেলল হেনরির পা থেকে। পরনের ওভারঅলটা অতিরিক্ত খাটো হয়ে গেছে ওর। সিসির দিকে তাকাল। বড় বড় ফুলওয়ালা নীল পোশাকটা মলিন, বিবর্ণ। ফসল ঘরে না তোলা পর্যন্ত কাপড় কিনে দেয়ার উপায় নেই।

'জানি, শহরে যাওয়ার বড় শখ তোমাদের,' কিশোর বলল।

'কিন্তু জমি না চষলে ফসল বোনা যাবে না। ফসল না হলে জায়গা-জমি বাড়ি-ঘর সব হারাতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু, কিশোরভাই,' পাশে বসে কিশোরের হাত খামচে ধরল সিসি। সবুজ চোখে উত্তেজনা। 'টাকার জন্যেই তো যেতে চাইছি আমি। ভাবছি, ঘোড়দৌড়ে আমিও অংশ নেব। প্রথম পুরস্কার এক লাখ পেসো আমিই পাব, দেখো। আমি জানি, আমি জিতব!'

'এক লাখ!' প্রতিধ্বনি করল যেন কিশোর। টাকাটা পেলে ফসল ওঠা পর্যন্ত কোনমতে চালিয়ে নিতে পারবে সংসার।

সত্যি কি জিততে পারবে সিসি?

পারবে না। এত এত প্রতিযোগী রয়েছে। তাদের সঙ্গে সিসির জেতা, টাকা পাওয়া, সংসার চালানো...দূর! ছেলেমানুষী চিন্তা।

'দেখো, সিসি,' বোঝাতে গেল সে, 'আমি জানি, তুমি ঘোড়ায় চড়ার ওস্তাদ। কিন্তু অন্য ওস্তাদেরাও আসবে। তাদের সঙ্গে পারবে না।'

ঝটকা দিয়ে হাতটা সরিয়ে নিল সিসি। জ্বলন্ত চোখে তাকাল। 'আমি জিতব! আমি জিতব! আমি জিতব! তুমি যদি আমাকে নিয়ে যেতে না চাও, আমি একলাই যাব।'

এতদিনে এই দৃষ্টির অর্থ জানা হয়ে গেছে কিশোরের। একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সিসি, কোনভাবেই আর ঠেকাতে পারবে না তাকে। এ ধরনের গোয়ার্তুমি কিশোরের নিজের মধ্যেও আছে। আরেকজনকে বুঝিয়ে লাভ নেই। উঠে দাঁড়াল সে। 'দাঁড়াও, হ্যাটটা নিয়ে আসি।'

চার

হেনরিকে কাঁধে বসিয়ে কাঁচা রাস্তা ধরে হেঁটে চলল কিশোর। পাশে পাশে হাঁটছে সিসি। টানতে টানতে নিয়ে চলেছে তার প্রিয় ঘোড়াটাকে। ঘোড়াটা কালো। নাম গোস্ট। পিঠে চড়েই যেতে পারত সিসি, কিন্তু দৌড়ের আগে গোস্টকে ক্লান্ত করতে চায় না।

সিসির জেতার সামান্যতম সম্ভাবনা নেই। কিন্তু আর কিছু বলল না কিশোর। শহরে গেলে সিসি নিজেই নিজের ভুল বুঝতে পারবে। জেতার কল্পনাটা স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।

শহরের কাছাকাছি হতে লোকের হট্টগোল আর ব্যান্ডের বাজনার শব্দ কানে এল। চৌরাস্তায় এসে মেইন রোডে উঠল ওরা। প্রধান সড়কটাও কাঁচা। রাস্তার ওপরে উঁচুতে আড়াআড়ি ভাবে ব্যানার টানানো হয়েছে। লোকে-লোকারণ্য। কাঠের তৈরি সারি সারি দোকান। দরজায় বড় করে লেখা নোটিশ ঝুলছে: ঘোড়দৌড়ের জন্যে দোকান বন্ধ।

রাস্তার পাশে টানানো সাইনবোর্ড পড়ে জানা গেল ঘোড়দৌড় হবে মেইন রোডে। বেলা ১টায়। ঘড়ি নেই কিশোরের হাতে। কোথায় হারিয়েছে, তা-ও মনে করতে পারল না; জন্মদিনে পাওয়া ক্যামেরাটার মত। জোর করে মন থেকে দূর করল রকি বীচের ভাবনা। ভাবলে ভীষণ কষ্ট হয়। সূর্য দেখে অনুমান করল একটা বাজতে আর বেশি দেরি নেই।

'দারুণ, তাই না?' উত্তেজনায় গলা কাঁপছে সিসির। 'মনে হচ্ছে আশপাশের অঞ্চলের আর কেউ নেই ঘরে, সব ঝেঁটিয়ে চলে

এসেছে রেস দেখতে।'

পায়ের আঙুলে ভর দিয়ে মাথা উঁচু করে টাউন হলের দিকে তাকাল সে। বারান্দা আর সিঁড়িতে দাঁড়ানো কিছু লোক। হাসাহাসি করছে, কথা বলছে। পিপার ওপর দাঁড়িয়ে আছে একজন লোক। দু'হাতে মাথার ওপর তুলে রেখেছে একটা বোর্ড। তাতে লেখা: ঘোড়দৌড়ে আগ্রহীরা এখানে এসে নাম লেখান।

'নামটা লিখিয়ে আসি,' সিসি বলল।

সিসির হাত থেকে লাগামটা নিয়ে নিল কিশোর। 'তুমি যাও। আমি গোস্টকে নিয়ে এগোচ্ছি।' এক কাঁধ থেকে অন্য কাঁধে সরাল হেনরিকে। সিসির পিছে পিছে চলল।

বারান্দায় দাঁড়ানো লোকটাকে বলল সিসি, 'আমি নাম লেখাতে চাই।'

মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল বারান্দার হট্টগোল। সবার চোখ সিসির দিকে। যেন আরেকটা মাথা গজিয়েছে ওর।

চওড়া কাঁধওয়ালা লম্বা এক যুবক এগিয়ে এল সামনে। 'মেয়েমানুষ। তুমি রেস খেলবে কি?'

নিজের নাকের ডগা টিপে ঘাম মুছল সিসি। 'কোথায় লেখা আছে সে-কথা, জন ফ্রেঞ্চ?'

গাঢ় লাল চুলে আঙুল চালাল যুবক। 'লেখা নেই, কিন্তু নিয়ম-কানুন সব মুখস্থ আমাদের। মেয়েমানুষ নেয়া হবে না।'

'অ, তাই নাকি। জানো যে, আমি খেললে জিততে পারবে না। ভয়ে নিতে চাইছ না।'

চোখের পাতা সরু হয়ে গেল জনের। 'তোমাকে ভয় পাব কেন! ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে কেউ পারে না।'

এগিয়ে গেল কিশোর। সে জানে, শহরের সবাই ফ্রেঞ্চদের ভয় পায়। এলাকার সবচেয়ে ধনী পরিবার। টাকা আর ক্ষমতার জোরে যে কাউকে ঘাড় ধরে বের করে দিতে পারে এ শহর থেকে। এখানকার স্থানীয় নয় ওরা। সেই সতেরোশো সালে উত্তর

আমেরিকা থেকে এসেছিল ওদের পূর্বপুরুষ। ওদের দেখতে পারে না কিশোর, বিশেষ করে দুই ভাই জন ফ্রেঞ্চ আর মার্ক ফ্রেঞ্চকে। 'কেউ যদি না-ই পারে, নিতে এত ভয় পাচ্ছেন কেন?'

'আরে নিয়ে নাও,' বলে উঠল আরেকটা ভারী কণ্ঠ।

সবগুলো চোখ ঘুরে গেল সেদিকে। দুটো সোনালি রঙের ঘোড়ার লাগাম ধরে টাউন হলের দিকে এগিয়ে আসছে মার্ক ফ্রেঞ্চ। হাঁটার তালে তালে ঢেউ খেলছে ঘোড়াগুলোর শক্তিশালী পেশিতে।

'দাও ওকে একটা সুযোগ,' সিসিকে দেখাল মার্ক। 'খেলুক না। বুঝুক কেমন মজা।'

দমে গেল কিশোর। ঘোড়া দুটো দেখেই বুঝে গেছে, ওগুলোর সঙ্গে পারতে হলে অলৌকিক ক্ষমতা লাগবে সিসির।

খুশিতে চিৎকার করে উঠল সিসি। 'থ্যাংকস, মার্ক। যাও কথা দিলাম, তোমাকে বেশি পেছনে ফেলব না আমি।'

সিসির আত্মবিশ্বাস অবাক করল কিশোরকে। ভাবল, বড় বেশি ছেলেমানুষ।

বারান্দায় দাঁড়ানো একজন লোক হাত নেড়ে ডাকল সিসিকে। বড় একটা চকবোর্ড দেখাল। রেসে অংশগ্রহণকারীদের নাম লেখা রয়েছে বোর্ডটায়।

'নাও, নিচে তোমার নাম লিখে দাও,' চক বাড়িয়ে দিল সে।

পরিষ্কার অক্ষরে দ্রুত নিজের নামটা লিখে দিল সিসি।

মার্ক আর জনকে পরস্পরের দিকে তাকাতে দেখল কিশোর। মুচকি হাসি ওদের ঠোঁটের কোণে। শঙ্কিত হলো সে। আল্লাহ্ই জানে, কি ফন্দি করেছে ওরা!

চকের গুঁড়ো কাপড়ে মুছে কিশোরের হাত থেকে লাগামটা নিয়ে নিল সিসি।

কিছুটা সরে এসে কানে কানে সিসিকে বলল কিশোর, 'ওদের ব্যাপারে সাবধান। ভাবভঙ্গি আমার ভাল লাগছে না।'

চোখের তারায় ছায়া পড়ল সিসির। 'ভঙ্গিই দেখায় ওরকম। ওদের আমি ভয় করি না।'

রেসের আগে বেশি কিছু বলে সিসিকে ঘাবড়ে দিতে চাইল না কিশোর। লাগামটা ফিরিয়ে দিল। হেনরিকে বলল, 'চলো, এমন কোথাও গিয়ে দাঁড়াই, ভালমত যাতে দেখতে পাই।'

'চিৎকার করে উৎসাহ দিও আমাকে,' সিসি বলল।

'দেব।'

হেনরিকে কাঁধে নিয়ে কোলাহল মুখর জনতাকে ঠেলে পথ করে এগোল কিশোর। কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে আছে দর্শকরা। রাস্তার শেষ মাথার দিকে তাকাল সে। প্রতিযোগীরা তৈরি হচ্ছে। মেইন রোড ধরে সোজা ছুটে যাবে শহরের শেষ মাথায়, সেখানে রাখা একটা পিপা ঘুরে আবার ফিরে যেতে হবে যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানে। রাস্তার মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়ানোই ভাল, দৌড়ের সবটাই তাহলে দেখা যাবে।

দর্শকদের মাঝে এক ভদ্রলোকের ওপর চোখ পড়ল কিশোরের। 'গুড ডে, মিস্টার রনসন।'

ঘুরে দাঁড়ালেন মিস্টার রনসন। তিনিও বিদেশী। এখানকার জেনারেল স্টোরের মালিক। এখানকার বাকি দোকানদারের মত আজকের দিনে তিনিও দোকান বন্ধ করে দিয়েছেন, কিন্তু গা থেকে সাদা অ্যাপ্রনটা খোলেননি। 'আরি, কিশোর। আজকাল তো তোমাকে দেখাই যায় না।'

জোর করে মুখে হাসি ফোটাল কিশোর, 'কি করব, এত কাজ।'

'ভাগ্যিস তোমাকে খুঁজে পেয়েছিল লং হার্ট, নইলে ছেলেমেয়েগুলোর যে কি দুর্দশা হতো ভাবাই যায় না।'

অ্যাপ্রনের পকেট থেকে একটা স্যারসাপ্যারিলা স্টিক বের করে হেনরির দিকে বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

লোভে চকচক করে উঠল হেনরির চোখ। ছোঁ মেরে প্রায় কেড়ে নিল ক্যান্ডিটা।

হেসে উঠলেন মিস্টার রনসন।

'অনেক ধন্যবাদ আপনাকে, মিস্টার রনসন।' কাঁধের ওপর হেনরিকে সোজা করে বসাল আবার কিশোর। 'ওর আর কি দোষ। কতদিন যে মিষ্টি কিনে দিতে পারি না ওকে।'

'নিজের ভাইও এতটা করে না, কিশোর। সত্যি তুমি...'

কথা শেষ করতে দিল না তাঁকে কিশোর। 'সিসি এসেছে রেসে অংশ নিতে।'

'ও জিতলে টাকার সমস্যাটা তোমাদের কমবে, তাই না?'

'হ্যাঁ। সেজন্যেই আসা।' রাস্তার শেষ মাথার দিকে তাকাল আবার কিশোর। ঘোড়া নিয়ে অপেক্ষা করছে প্রতিযোগীরা। সিসিকে দেখতে পেল। গলায় হাত বুলিয়ে আদর করছে গোস্টকে। হাত তুলে দেখাল কিশোর, 'হেনরি, ওই যে দেখো, সিসি।'

হাততালি দিল হেনরি। বোনের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ল।

হেসে সিসিও হাত নেড়ে জবাব দিল।

'হার্ট প্রায়ই আমাকে বলত,' কিশোরকে বললেন মিস্টার রনসন, 'জন্তু-জানোয়ারকে বশ করার অসাধারণ ক্ষমতা রয়েছে সিসির মধ্যে।'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'এখানেই দাঁড়াই, কি বলো, হেনরি?'

সরে জায়গা করে দিলেন মিস্টার রনসন। 'হ্যাঁ হ্যাঁ, দাঁড়াও না। এসো, ঢুকে পড়ো।...তবে যতই ক্ষমতা থাক, ফ্রেঞ্চদের সঙ্গে জেতা মুখের কথা নয়। সিসি পারবে না। একেবারেই ছেলেমানুষ সে, ঘোড়াটাও তেমন কিছু না। আমার কি মনে হয়, জানো? যদি পারেও, না জেতাই ভাল হবে সিসির জন্যে। জিততে না পারলে পাগলা কুত্তা হয়ে যাবে দুই ভাই।'

পাঁচ

প্রতিযোগীদের ঘোড়াগুলোর সামনে টানটান করে একটা রশি ধরে রেখেছে দুটো ছেলে।

'ঘোড়ায় চড়ো!' চিৎকার করে উঠল গ্যারিবাল্ড। রেস পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছে তার ওপর। শুধু ব্যাংকের মালিকই নয়, শহরের ভালমন্দ দেখার ভার্‌ও তার...

ভালমন্দ! মনটা তেতো হয়ে গেল কিশোরের। ভালটা কখনোই চোখে পড়ে না গ্যারিবাল্ডের, কেবল মন্দটাই দেখে–এই যেমন একটা অসহায় পরিবারকে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করার জন্যে উঠে-পড়ে লেগেছে। গতকাল এসে হুমকি দিয়ে গেছে কিশোরকে। অথচ এখন গোল ভুঁড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে এমন হাসি হাসছে যেন ঈশ্বরের পাঠানো দেবদূত। গাল দুটোও কুৎসিত রকমের ফোলা লোকটার। ঘেন্না লাগে! থুতু ফেলতে গিয়েও আশেপাশে লোক থাকায় ফেলল না কিশোর।

রশির কাছে এসে দাঁড়াল ডজনখানেক ঘোড়া। লাগাম ধরে তৈরি হয়ে আছে সওয়ারিরা।

ওদের মধ্যে সিসিই একমাত্র মেয়ে। দূর থেকেও ওর রক্তিম গাল দেখে মনের উত্তেজনা আঁচ করতে পারল কিশোর।

উত্তেজনার চেয়ে শঙ্কা বেশি কিশোরের মনে। সিসির দুই পাশে দাঁড়িয়েছে দুই ভাই–জন আর মার্ক। দুদিক থেকে চেপে এসে গোস্টকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছে রশির কাছ থেকে। জনের বাহুতে ধাক্কা মারল সিসি। হেসে উঠল জন।

নিজের ঘোড়া দিয়ে চাপ দিতে লাগল গোস্টের পেটে।

ওদের উদ্দেশ্য বুঝে ভয় পেয়ে গেল কিশোর। রেসে জেতার চেয়ে সিসিকে আহত করার দিকেই যেন ওদের খেয়াল বেশি। ওদের মাঝখানে বড়ই ক্ষুদ্র আর ভঙ্গুর লাগছে বেচারি সিসিকে।

হাত উঁচু করল গ্যারিবাল্ডি। হাতে পিস্তল। আকাশের দিকে তাক করে গুলি করল একবার। হাত থেকে রশির দুই মাথা ছেড়ে দিল ছেলে দুটো।

রশিটা মাটিতে পড়ে যেতেই চিৎকার করে উঠল অশ্বারোহীরা। লাগামে টান দিয়ে চাপড় মারল ঘোড়ার গলায়। লাফ দিয়ে আগে বাড়ল ঘোড়াগুলো। ধুলোর ঝড় উঠল ওগুলোর ছুটন্ত খুরের আঘাতে।

নাকেমুখে ধুলো ঢুকে যেতে কেশে উঠল কিশোর। চোখ বন্ধ করে ফেলল। কানের কাছে চিৎকার করছে উত্তেজিত দর্শকেরা: 'জোরে, জন! মার্ক, আরও জোরে!' রেসে যেন কেবল ওই দুজনই প্রতিযোগিতা করছে।

লোকে ভয় পায় ওদের। মনে মনে অন্য কাউকে সমর্থন করলেও প্রকাশ্যে সেটা জানানোর সাহস নেই। সিসির মত দুর্বল একটা মেয়ের পক্ষ নিলে নিজের বিপদ ডেকে আনা ছাড়া আর কিছু পাবে না।

জোরে জোরে হাততালি দিচ্ছে হেনরি। পা ছুঁড়ছে। ওর খুদে পায়ের লাথি লাগছে কিশোরের বুকে। কাঁধের ওপর তাকে সোজা করে বসাল কিশোর। দর্শকদের ঠেলে এগিয়ে গেল ভালমত দেখার জন্যে।

প্রাণপণে ছুটছে সিসি। দুই পাশে মার্ক আর জন। শুরু থেকেই গোস্টের প্রায় গা ঘেঁষে রয়েছে ঘোড়া দুটো। গোস্টের গায়ে ধাক্কা লাগছে। আগে বাড়ার পথ পাচ্ছে না সিসি।

হঠাৎ, হাত বাড়িয়ে গোস্টের লাগাম ধরে হ্যাঁচকা টান মারল মার্ক।

এলোমেলো পা ফেলতে শুরু করল গোস্ট। চিৎকার করে জোরে লাগাম টেনে ধরল সিসি।

'সিসি! ধরে রাখো! ছেড়ো না!' গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল কিশোর। পেটের ভেতরে খামচি দিয়ে ধরেছে তার। ঘোড়াটাকে নিয়ে এখন সিসি পড়ে গেলে, দুজনেই মরবে, অন্য ঘোড়াগুলোর পায়ের চাপে পিষ্ট হয়ে।

নিষ্ঠুর, কুৎসিত হাসি দেখতে পেল দুই ভাইয়ের মুখে।

সামলে নিয়েছে গোস্ট। তাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে সিসি। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। প্রায় সবগুলো ঘোড়াই এখন গোস্টকে পার হয়ে চলে গেছে। আগে বাড়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে সিসি। ঘোড়ার কাঁধ ডলে, পেটে পায়ের গুঁতো মেরে জোরে ছোটার ইঙ্গিত করছে।

গতি বাড়তে লাগল ঘোড়াটার। বাতাসে উড়ছে সিসির বেণী। দেখতে দেখতে ধরে ফেলল সামনের ঘোড়াটাকে। দ্রুত পাশ কাটাল ওটার। তারপর আরেকটার। আরও একটার। সামনে নুয়ে পড়ল সিসি। গোস্টের ঘামে ভেজা চকচকে কাঁধের ওপর নেমে এসেছে থুতনি।

কি করছে ও? অবাক হলো কিশোর। সিসির ঠোঁট যে নড়ছে কোন সন্দেহ নেই তাতে। যেন ফিসফিস করে কথা বলছে ঘোড়াটার সঙ্গে।

স্তব্ধ হয়ে গেছে কিশোর। একটার পর একটা ঘোড়াকে পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে সিসি। তীব্র গতিতে পিপাটার চারপাশে ঘুরে আসার সময় ঘোড়ার গায়ের ধাক্কা লাগল পিপাটাতে। দুলে উঠল ওটা।

দম আটকে ফেলল কিশোর। পিপাটা উল্টে পড়ে গেলে ডিসকোয়ালিফাই হবে সিসি। কিন্তু ভাগ্য ভাল, পড়ল না।

পিপা ঘুরে এসে বাকি ঘোড়াগুলোকে পেছনে ফেলতে শুরু করল গোস্ট। কোনদিকে নজর নেই আর। লক্ষ্য যেন

একটাই–শুধুই এগিয়ে যাওয়া; ধুলো-ধূসরিত পথের মাঝে, ধুলোর মেঘের পেছনে ফেলে আসা বাকি ঘোড়াগুলোকে।

অবিশ্বাস্য দৃশ্য! জন আর মার্কের দুটো ঘোড়া বাদে বাকি সবগুলো ঘোড়ার আগে চলে গেছে গোস্ট।

'হেনরি, দেখো দেখো!' আনন্দে গলা চিরে চিৎকার বেরিয়ে এল কিশোরের। 'জিতে যাচ্ছে সিসি!'

ওর মাথাটাকেই যেন তবলা বাজিয়ে চাটি মারতে আরম্ভ করল হেনরি।

'সামনের ঘোড়া দুটোকে হারাতে পারলেই জিতে যাবে সিসি!' চাটির পরোয়া না করে আবার চিৎকার করে উঠল কিশোর।

জনের কয়েক ফুট পেছনে রয়েছে সিসি। হালকা ছিপছিপে শরীর নিয়ে যেন উড়ছে গোস্ট। ধরে ফেলছে বিশালদেহী সোনালি ঘোড়াটাকে।

ফিরে তাকাল মার্ক। হাসতে শুরু করল সিসির দিকে তাকিয়ে।

ওর উদ্দেশ্য বুঝে আতঙ্কিত হয়ে গেল কিশোর। আবার যদি লাগাম ধরে টান মারে, এই গতিতে থেকে কোনমতেই সামলাতে পারবে না গোস্ট। ডিগবাজি খেয়ে পড়বে। ঘোড়া আর তার সওয়ারি, দুজনেরই ঘাড় ভাঙবে।

চিৎকার করে সাবধান করতে গেল কিশোর। স্বর বেরোল না।

হাত বাড়াল মার্ক।

চাটি বাজানো থেমে গেছে হেনরির। কিশোরের চুল আঁকড়ে ধরেছে সে। শক্ত হয়ে গেছে শরীর। ফোঁপাতে শুরু করল। চিৎকার করে কেঁদে উঠবে মনে হচ্ছে।

ভয়ঙ্কর ওই দৃশ্য হেনরিকে দেখতে দিতে চাইল না কিশোর। টেনে তাকে কাঁধ থেকে নামানোর চেষ্টা করল। কিন্তু সেঁটে বসে আছে হেনরি। কোনমতেই তাকে নামানো গেল না।

কোন রকম আগাম সঙ্কেত না দিয়ে আচমকা পেছনের পায়ে

ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল মার্কের ঘোড়াটা। মার্কের একটা হাত বাড়ানোই আছে গোস্টের দিকে। ভয়াবহ হাঁক ছেড়ে, নাকের মাংস কুঁচকে ওপরে তুলে নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল জনের ঘোড়াটার ওপর। কামড় বসাল ঘাড়ে। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে ছিটকে পড়ল দুই ভাইয়ের ওপর। মার্কের আর্তনাদ কানে এল কিশোরের। ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে সে। মরিয়া হয়ে জিন ধরে ঝুলে থাকার চেষ্টা করল। কিন্তু থাকতে দিচ্ছে না তাকে খেপা ঘোড়াটা।

জনের ভয়ার্ত চিৎকারও কানে আসছে। কামড় খেয়ে উন্মাদ হয়ে যাওয়া ঘোড়ার পিঠে বসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। মাটির কাছে মুখ নামিয়ে দিল ঘোড়াটা। পেছনের দুই পা উঁচু করে ছুঁড়ে দিল শূন্যে। এই উন্মাদ ঝাঁকুনি সহ্য করতে পারল না জন। শেষ রক্ষা করতে পারল না। লাগাম থেকে ছুটে গেল হাত। দুই হাত দুদিকে বাড়িয়ে থাবা মেরে বাতাস ধরার চেষ্টা করল যেন। উল্টে পড়ে গেল জিনের ওপর থেকে। মাটিতে পড়ার শব্দটা স্পষ্ট শুনতে পেল কিশোর। জনের একটা হাত মাটিতে লম্বা হয়ে পড়ল। সামনের দুই খুর সবেগে সেই হাতের ওপর নামিয়ে আনল মার্কের ঘোড়াটা।

চোখ বুজে ফেলল কিশোর। জনের যন্ত্রণাকাতর ভয়ানক আর্তচিৎকার কানে এল তার। চোখ মেলল আবার। দেখল, মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে জন। তার ঘোড়াটা তীরবেগে ছুটে চলে যাচ্ছে। খুরের আঘাতে হাড় ভেঙে গিয়ে চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছে চোখা মাথা। মাটি ভেজাচ্ছে গাঢ় লাল রক্ত।

চিৎকার-চেঁচামেচি হই-চই করছে লোকে। হাত তুলে দেখাচ্ছে। জনের দিকে চোখ ফেরাল কিশোর। সিসির ঘোড়াটা চলে গেছে রশির কাছে।

'জিতে গেছি! জিতে গেছি! হেনরি, জিতে গেছি আমরা!' কাঁধে বোঝা নিয়েই নাচতে শুরু করল কিশোর। হেনরির মুখ

দেখতে পাচ্ছে না। তবে বুঝতে পারছে, নীরব হাসিতে দাঁত বেরিয়ে পড়েছে ওর।

ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে ওদের দিকে ছুটে এল সিসি। 'কিশোরভাই! হেনরি! আমি জিতে গেছি! জিতে গেছি!'

কাছে এসে কিশোরের হাত জড়িয়ে ধরল সে। 'কি, বলেছিলাম না, আমিই জিতব! তুমি তো বিশ্বাস করোনি!'

'হ্যাঁ, দেখলাম তো!' সিসির কাঁধ চাপড়ে দিল কিশোর।

এতক্ষণে কিশোরের কাঁধ থেকে নামল হেনরি। গাছ থেকে নামার মত করে পিছলে নেমে গিয়ে বোনের কোমর জড়িয়ে ধরল। মুখ চেপে ধরল পেটে।

আদর করে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সিসি। 'তোকে অনেক ক্যান্ডি কিনে দেব, হেনরি। অনেক টাকার ব্যবস্থা হয়ে গেল।'

আনন্দে খিলখিল করে হেসে উঠল সিসি।

তার হাসির শব্দ মিলাতে না মিলাতেই শীতল শিহরণ বয়ে গেল কিশোরের মেরুদণ্ড বেয়ে। লোকে ঘিরে ফেলেছে ওদের তিনজনকে।

জোরে কথা বলছে না কেউ। ফিসফাস করছে সবাই। সে-সব ছাপিয়ে বার বার কানে আসছে জনের যন্ত্রণাকাতর গোঙানি। যে ভঙ্গিতে সিসির দিকে তাকাচ্ছে লোকে, দেখে গায়ে কাঁটা দিল কিশোরের।

'খবরদার, ওর বেশি কাছে যেয়ো না!' চিৎকার করে উঠল একজন। 'মেয়েটা মানুষ না, পিশাচ!'

'শয়তানের পূজারী!' বলল আরেকজন। 'জন্তু-জানোয়ারেও ওর কথা শোনে! দেখলে না কেমন করে নিজের ঘোড়াটার কানে কানে কথা বলল? খেপিয়ে তুলল ফ্রেঞ্চদের ঘোড়াগুলোকে! ওই ডাইনীটাই দুটো ঘোড়ার লড়াই লাগিয়েছে!'

বেশির ভাগ লোক তার কথা সমর্থন করল। গুঞ্জন উঠল

তাদের মাঝে। ভুরু কুঁচকে সিসির দিকে তাকিয়ে আছে। চোখে সন্দেহ।

'ও ডাইনী!' চিৎকার করে উঠল আরেকজন।

'ঠিক ঠিক, ঠিক বলেছ!' বলে উঠল অন্য আরেকজন। সুর করে বলতে শুরু করল, 'ডাইনী! ডাইনী! ডাইনী!'

তার কণ্ঠে কণ্ঠ মেলাল আরও অনেকে।

ওদের ভাবভঙ্গি দেখে শিউরে উঠল কিশোর। মনে পড়ে গেল মধ্যযুগের ডাইনী পোড়ানোর কথা।

ছয়

'থামুন! থামুন আপনারা! দোহাই আপনাদের! শান্ত হোন!' পাগলের মত চিৎকার শুরু করল কিশোর। 'সিসি ডাইনী নয়! তাকে আমি চিনি। তার মত ভাল মেয়ে কম দেখেছি আমি।'

'কিশোর ভাই, ওরা আমাকে যা-তা বলছে,' কেঁদে ফেলল সিসি। 'আমি খারাপ কিছু নই। মোটেও ঠিক নয় ওদের কথা।'

সিসির দিকে তাকাল কিশোর। ওর সবুজ চোখের তারা পানিতে ঢাকা পড়েছে।

'ঠিক তো নয়ই, আমি কি জানি না সেটা,' সিসির কাঁধে হাত রেখে তাকে আশ্বস্ত করতে চাইল কিশোর। ভয়ে কাঁপছে সিসি।

কিশোরের প্যান্ট খামচে ধরে পায়ের সঙ্গে সেঁটে রয়েছে হেনরি। ওর মাথায়ও আলতো চাপড় দিয়ে অভয় দেয়ার চেষ্টা করল কিশোর।

কি করে ভাবছে ওরা সিসির মত একটা মেয়ে ডাইনী হতে

পারে? রাগ ফুঁসে উঠতে লাগল কিশোরের মনের মধ্যে।

'ওকে খারাপ ভাবছেন কেন আপনারা?' লোকগুলোকে বোঝাতে গেল সে। 'লং হার্ট জন্তু-জানোয়ারদের বশ করতে জানতেন, তাঁর সঙ্গে থেকে থেকে ওদের সামলাতে শিখেছে সিসি। জানোয়ারেরা তাকে বিশ্বাস করে যেমন আমি করি।'

দুই হাতে জনতাকে ঠেলে সরিয়ে এসে কিশোরের মুখোমুখি দাঁড়াল মার্ক ফ্রেঞ্চ। জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। চিৎকার করে উঠল, 'ওই ইনডিয়ান হারামজাদাটাই ছিল যত নষ্টের গোড়া। ওর ভয়ে গাঁয়ের কেউ কথা বলতে পারত না। সবাই ভেবেছিল, মরেছে, গাঁ-সুদ্ধ বেঁচেছে। কিন্তু এখন তো দেখা যাচ্ছে শয়তান কখনও মরে না। বংশধর রেখে যায়। সমস্ত তুকতাক শিখিয়ে দিয়ে গেছে এই ডাইনীটাকে।' সিসির দিকে আঙুল তুলল সে। 'ডাইনীদের চেহারা ভালই হয়। নইলে মানুষের মন ভোলাবে কি করে?'

সবাই মার্কের কথায় সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাতে লাগল। জোরাল গুঞ্জন উঠল তাদের মাঝে।

'আপনারা যা-ই বলুন,' জনতার দিকে তাকিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করল কিশোর, 'ঘোড়াগুলোর খেপে ওঠার পেছনে সিসির কোন হাত ছিল না। আপনারা নিজের চোখে দেখেছেন লাগাম টেনে ধরে সিসির ঘোড়াটাকে ফেলে দিতে চেয়েছিল জন। পড়ে গেলে ঘোড়াটা সহ মারা পড়ত সিসি। পরের বার যখন আবার একই কাজ করতে গিয়েছিল, বেসামাল হয়ে পড়ে ওদের ঘোড়া দুটো। এটা কি সিসির দোষ?'

কিশোরের দিক থেকে জ্বলন্ত চোখের দৃষ্টি জনতার দিকে ফেরাল মার্ক। অস্বস্তিতে পায়ের ওপর ভার বদল করল কেউ কেউ। সবাই চোখ নামিয়ে নিল। মার্কের বিরুদ্ধে সত্যি কথাটা বলতেও ভয় পাচ্ছে ওরা। ওর আক্রোশের শিকার হয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে ধনে-প্রাণে মারা পড়তে চায় না। গলা শুকিয়ে গেল কিশোরের।

'তুমি কি বলতে চাও আমার ভাই অন্যায় কিছু করেছে?' কিশোরের দিকে এক পা এগিয়ে গেল মার্ক।

'কি করেছে সেটা সবাই দেখেছে। আমি কেবল সত্যি কথাটা বললাম।'

চোখের পাতা সরু সরু হয়ে এল মার্কের। 'ওই বাড়ির সবগুলো মানুষ শয়তান। ফকির-ফোকরা যেগুলো বাইরে থেকে আসে সেগুলোও শয়তান।'

'আমার তো ধারণা, ফকির-ফোকরাগুলো আসে বলেই এই শয়তানের গাঁয়ে মানুষ এখনও বেঁচে আছে, নইলে বহু আগেই জমিদার-ফমিদারদের অত্যাচারে খতম হয়ে যেত। আর ফমিদারগুলোও তো বাইরে থেকেই ঘটি-কম্বল নিয়ে আসা। এখানকার নিরীহ মানুষের ঘাড় মটকে রক্ত চুষে বড়লোক হয়েছে।'

'কি বললি! ফকিরের বাচ্চার এত্ত বড় সাহস!' চড় মারার ভঙ্গিতে হাত উঠে গেল মার্কের।

দুই ধাক্কায় সিসি আর হেনরিকে দুই পাশে সরিয়ে দিল কিশোর। চোখের পলকে ডান পা'টা চলে এল সামনে। সামনের দিকে সামান্য কুঁজো হয়ে গেছে দেহ। কারাতে মারের কায়দায় দুই হাত উঠে গেছে, একটা সামনে, একটা পেছনে।

চীনা মারের এই ভঙ্গিটা মার্কের একেবারে অপরিচিত নয়। কিশোরের ক্ষিপ্রতা আর চোখের ভয়ঙ্কর দৃষ্টি দমিয়ে দিল তাকে।

ভুরু নাচাল কিশোর, 'কি হলো, মারছ না কেন? মারো! দেখি তোমার তাকত! মেয়েমানুষের সঙ্গে হেরে ভূত হও, চালাকি করেও জিততে পারো না, আবার বড় বড় কথা বলতে এসেছ!'

'খবরদার! মুখ সামলে কথা বলবে!' গর্জে উঠল মার্ক।

'তাই তো করছিলাম এতক্ষণ! দুর্বল পেলে মারতে খুব মজা লাগে, না? তোমার ভাইয়ের ভেঙেছে হাত, আমি তোমার ঘাড়টা মটকে দেব। এসো! মারো!'

কিশোরের মারমুখো ভঙ্গি দেখে আর এগোতে সাহস করল না মার্ক। এক পা পিছিয়ে গেল। দুই হাত ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'আজকে ছেড়ে দিলাম। আরেকদিন এ রকম বেয়াদবি করতে দেখলে...'

'আমরা কিচ্ছু করিনি,' জবাব দিল কিশোর। 'শয়তানিটা তোমরা শুরু করেছ। সিসিকে রেসে অংশ নিতে দেয়ার ইচ্ছে ছিল না তোমাদের।'

'হ্যাঁ, সত্যিই নিতে চাইনি,' মাথা ঝাঁকাল মার্ক। 'কেন জানো? কাচ্চু-পিকচুতে তোমাদের চাই না আমরা। বাপ-মা দুটো উধাও হয়েছে। শয়তানের চেলা ছিল বোধহয়, শয়তানেই ধরে নিয়ে গেছে দোজখের মানুষকে জ্বালানোর জন্যে। বাকি দুটো চেলা ওয়্যাগন উল্টে মরেছে। বাকি আছ তোমরা।' মাটিতে থু-থু ফেলল মার্ক। সাহস করে কিশোরের চোখে আর ফেলতে পারল না। 'এতিমদের মিছিলের সঙ্গে বিদেয় হয়ে গেলেই পারো। শুনলাম, কয়েক দিনের মধ্যেই এখান দিয়ে যাবে একটা কাফেলা। যাওয়ার জন্যে সাহায্য চাইলে বরং সাহায্য করতে পারি। চাইকি, কিছু পয়সাও ভিক্ষে দিয়ে দেব।'

কিশোর কোন জবাব দেবার আগেই ঝটকা দিয়ে ঘুরে গটমট করে চলে গেল মার্ক।

চারপাশে ঘিরে থাকা জনতার দিকে তাকাল কিশোর। কারও চোখে ভয়। কারও রাগ। মিস্টার রনসনকে দেখল চোখে সহানুভূতি নিয়ে তাকিয়ে আছেন ওদের দিকে। কিশোরের চোখে চোখ পড়তেই মনে হলো কথা বলবেন। কিন্তু ওই মুহূর্তে পাশে এসে দাঁড়ালেন মিসেস রনসন। স্বামীর হাত ধরে টেনে সরিয়ে নিয়ে গেলেন তাঁকে।

কেউ আসবে না সাহায্য করতে, বুঝে গেল কিশোর। 'ফ্রেঞ্চরা জিততে পারেনি,' জনতার উদ্দেশ্যে বলল সে, 'আপনারা সবাই দেখেছেন। সিসি জিতেছে। প্রথম পুরস্কারটা তার পাওনা এখন।'

সামনে এগিয়ে এল গ্যারিবাল্ড। 'এ খেলার বিচারক হিসেবে আমার রায়, চালাকি করে জিতেছে সিসি। তার জেতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়। এমতাবস্থায় তাকে পুরস্কারের টাকা দেয়া উচিত হবে না।' জনতার দিকে তাকিয়ে হাত নাড়ল সে। 'আমার রায়ে কারও কোন আপত্তি আছে?'

একটা লোকও জবাব দিল না। সবাই নীরব।

'সিসি জিতেছে,' দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করে দিল কিশোর, 'আপনি তাকে টাকাটা দেন বা না দেন।'

'ইয়াং ম্যান, যথেষ্ট বলে ফেলেছ। আর একটা বাক্যও না। যদি ভাল চাও, ছেলে-মেয়ে দুটোকে নিয়ে এখন বিদেয় হও এখান থেকে,' কর্কশ কণ্ঠে বলল গ্যারিবাল্ড।

লোকটার ফোলা ভুঁড়িতে ঘুসি মারার প্রবল ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করল কিশোর। এত রাগ তার কমই হয়েছে। আঙুলগুলো মুঠোবদ্ধ হয়ে গেছে।

ব্যাপারটা লক্ষ করল সিসি। তাড়াতাড়ি কিশোরের হাত ধরে টান দিল, 'এসো, কিশোরভাই। চলো, বাড়ি চলো।...তোমরা এগোও, আমি গোস্টকে নিয়ে আসি।'

ঘুরে দাঁড়াল কিশোর। গ্যারিবাল্ড বা অন্য কারও দিকে একটিবারের জন্যে ফিরে তাকাল না আর। ওদের প্রতি তীব্র ঘৃণাটা বুঝিয়ে দিয়ে হেনরিকে বলল, 'চলো, হেনরি।'

শহর থেকে বেরোনোর রাস্তা ধরে দ্রুত এগিয়ে চলল সে।

'মগজে ওগুলোর একটারও ঘিলু নেই,' আনমনে বিড়বিড় করতে লাগল কিশোর। 'কুসংস্কারে ভরা। নইলে কি আর সিসিকে ডাইনী বলে।'

হেনরির দিকে তাকাল সে। নিষ্পাপ চোখ মেলে তার দিকে তাকাল হেনরি। বড় মিষ্টি লাগল মুখটা। রাগ অনেক কমে গেল কিশোরের। 'ভয় নেই, হেনরি। তোমাদের কিশোরভাই বেঁচে থাকতে তোমাদের একটা চুলও কেউ খসাতে পারবে না। গাঁয়ের

লোককে নিয়েও চিন্তা নেই। সিসিকে টাকা দিতে হয়নি, চুকে গেছে। ঘটনাটা নিয়ে আর বিশেষ মাথা ঘামাবে না কেউ।'

হেনরিকে বলল বটে, কিন্তু কথাটা নিজেই বিশ্বাস করতে পারল না কিশোর। ফ্রেঞ্চদের কোন বিশ্বাস নেই। তাদের সঙ্গে জুটেছে আবার গ্যারিবাল্ডের মত একটা ভয়ানক কুটিল পা-চাটা লোক।

শহরের বাইরে চৌরাস্তাটায় এসে সিসির অপেক্ষা করল ওরা। খানিক পরেই গোস্টের লাগাম ধরে টেনে নিয়ে আসতে দেখা গেল সিসিকে। ঘোড়াটা কাছে এলে হেনরিকে ওটার পিঠে বসিয়ে দিল কিশোর।

'কিশোরভাই, সত্যি তুমি আমাদেরকে এতিম আর অসহায়দের মিছিলে দিয়ে দেবে?' হাঁটতে হাঁটতে জিজ্ঞেস করল সিসি। গলা কেঁপে উঠল ওর।

ফিরে তাকাল কিশোর। 'না। ফার্মটা আছে এখনও। মাথার ওপর চালা আছে আমাদের, চাষের খেত আছে; আমরা তো বাস্তুহারা নই।'

আশ্বস্ত হলো সিসি। কিন্তু কিশোর হতে পারল না। আর কতদিন ওদের থাকতে দেবে গ্যারিবাল্ড? আজকের ঘটনার পর যে কোনদিন এসে হাজির হবে সে। টাকা দিতে না পারলে ঘাড় ধরে বের করে দেবে। কিছুই করার থাকবে না তখন।

দমিয়ে দেয়া ভাবনাগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেলল কিশোর। সিসির দিকে তাকাল। হাসল সিসি। দুশ্চিন্তার ছাপ নেই আর মুখে। হেনরির মুখেও ভয় নেই। এদেরকে অসহায় অবস্থায় বিপদের মধ্যে ফেলে কোথাও চলে যাওয়া এখন অসম্ভব—ভাবছে কিশোর। এমন এক বেকায়দা অবস্থায় পড়েছে, নিজের কথাও ভাবতে পারছে না। নিজে যে কি করে এখানে এল, কে তাকে ফেলে গেল, সেই রহস্যের সমাধান করারও সুযোগ নেই। ছেলে-মেয়ে দুটোর একটা কিনারা না করে বাড়ি ফিরে যাওয়ারও চেষ্টা

করতে পারছে না। সিসি আর হেনরির একটা গতি না করে এই পরিস্থিতিতে ওদের ফেলে যেতে পারবে না সে।

'সিসি,' বাড়ির দিকে হাঁটতে হাঁটতে বলল সে, 'কোন চিন্তা কোরো না। তোমাদের ব্যবস্থা না করে আমি কোথাও যাব না।'

'তারমানে ব্যবস্থা হলেই তুমি আমাদের ফেলে চলে যাবে!' চোখ ছলছল করে উঠল সিসির।

'আরি, আবার কাঁদবে নাকি!...থাক থাক, যাব না কোথাও! কেঁদো না! যদি কোথাও যাই, মানে যেতে হয়, তোমাদের সঙ্গে নিয়েই যাব।...নাও, এখন চোখ মোছো। বোকা মেয়ে কোথাকার।'

চোখ মুছল সিসি। কিন্তু হাসি ফুটল না মুখে। 'কিশোরভাই, তুমিও কি আমাকে ডাইনী মনে করো? লোকগুলো যা বলেছে, বিশ্বাস করো?'

'পাগল নাকি! আমি কি ওগুলোর মত ছাগল? জন্তু-জানোয়ারকে কথা শোনানোর ক্ষমতা আছে তোমার, গর্ব করার মত বিদ্যে এটা। এখন তো আমার রীতিমত দুঃখ হচ্ছে, আমিও শিখলাম না কেন!'

'শেখোনি ভাল করেছ। তাহলে তোমাকেও শয়তান বলত লোকগুলো।'

'তা তো বলতই।'

'তবে তোমার কিছু করতে পারত না। যা সাহস দেখলাম আজ তোমার। এতগুলো লোকের বিরুদ্ধে যেভাবে রুখে দাঁড়ালে। মার্কের মত খেপা শুয়োরও তোমার ধমকে কুঁকড়ে গেল।...যা-ই বলো, ওর ভাইটার হাত ভাঙাতে আমি খুশিই হয়েছি। ঘাড় মটকে মরলে আরও খুশি হতাম।'

খিলখিল করে হাসতে লাগল সিসি। বোনকে হাসতে দেখেই যেন হেনরিও হাসল।

কিন্তু কিশোর হাসতে পারল না। সিসির কথা আর হাসি চমকে দিয়েছে তাকে। মেরুদণ্ড বেয়ে নেমে গেল শীতল শিহরণ।

সাত

দিন কয়েক পর। কুড়াল দিয়ে লাকড়ি ফাড়তে ফাড়তে ভাবছে কিশোর–এই একটি কাজ অন্তত জানোয়ারের সাহায্য ছাড়া করা যায়। মাথার ওপর কুড়াল তুলে ঘুরিয়ে কোপ মারল আবার লাকড়ির গায়ে। কাঠের টুকরো ছড়িয়ে পড়তে লাগল চারদিকে। একপাশে জমে উঠছে লাকড়ির স্তূপ। লক্ষই নেই সেদিকে। তার মন জুড়ে রয়েছে অচষা জমিটা।

পর পর কয়েকদিন খচ্চরটাকে দিয়ে হাল টানানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে সে। গ্যাঁট হয়ে থাকে। কোনমতেই ওটাকে দিয়ে কাজ করাতে পারে না। এগোতেই চায় না। প্রতিরাতে যখন বিছানায় এসে গড়িয়ে পড়ে কিশোর, সারা গায়ে ব্যথা, ক্লান্তিতে ভেঙে আসে, তখনও ঘুম আসতে চায় না তার। গ্যারিবাল্ডের মুখটা কুৎসিত, বিকৃত হয়ে চোখের সামনে ভাসতে থাকে। সেই যে পেটের মধ্যে খামচি দিয়ে ধরে, আর যেতে চায় না।

আজ আসেনি গ্যারিবাল্ড। কাল আসবে। কিংবা পরশু দিন। আসবেই সে, জানে কিশোর। সামান্য যে কটা টাকা আছে আর, তা দিয়ে গ্যারিবাল্ডের ঋণ শোধ হবে না। বাড়িটা কেড়ে নেবে গ্যারিবাল্ড।

ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে তখন কোথায় যাবে? কি করবে?

কাফেলার কথাটা প্রথমে পছন্দ হয়নি তার। কিন্তু এখন যতই ভাবছে, ততই মনে হচ্ছে সে-ই ভাল। চলেই যাবে। আর কোন উপায়ও নেই। এ শহরে কেউ কাজ দেবে না তাকে। খাবার দেবে

না! তার চেয়ে মিছিলে যোগ দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করাই উচিত। কি করে এল সে, সেই রহস্যের সমাধানের চেয়ে বেঁচে থাকার চিন্তা করা দরকার আগে।

কুপিয়েই চলেছে কিশোর। কুপিয়েই চলেছে। তার আশঙ্কাটা কোনমতেই প্রকাশ করতে পারে না সিসি আর হেনরির কাছে। মুখ ফুটে বলতে পারে না যে কোন সময় এসে ওদেরকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে গ্যারিবাল্ড। এতিমের মিছিলে ছাড়া তখন আর কোথাও ঠাঁই হবে না ওদের…

ঘোড়ার খুরের শব্দে ভাবনার সুতোটা ছিঁড়ে গেল তার। কুড়ালটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফিরে তাকাল। ওদের পড়শী আরনি হুফ। খোলা মাঠের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসছে। পাশাপাশিই থাকে, কিন্তু দেখা-সাক্ষাৎ খুব একটা হয় না।

আরনির ছুটে আসার ভঙ্গিতে অশনি-সঙ্কেত দেখতে পেল কিশোর। পেটের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। ইদানীং দুঃসংবাদের আশঙ্কা দেখলেই এমন হয় তার। হেঁটে গেল সামনের বারান্দার দিকে।

সিঁড়িতে বসে আছে হেনরি। কাঠের একটা খেলনা ঘোড়ার পা ছুটে গেছে, কোনমতেই লাগাতে পারছে না। লাগিয়ে দিল কিশোর। মুখ তুলে তার দিকে তাকিয়ে হাসল হেনরি।

'কি হয়েছিল ঘোড়াটার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

হাসিটা মুছে গেল হেনরির মুখ থেকে। কথা বলে জবাব দিতে না পারার দুঃখেই যেন জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাতে লাগল।

ওর চুলে আঙুল বুলিয়ে দিল কিশোর। 'থাক, হেনরি। একদিন তুমি আবার কথা বলতে পারবে।'

লাগাম টেনে ঘোড়া থামাল আরনি। মুখ তুলে তাকাল কিশোর। মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে মৃদু ডাক ছাড়ল ঘোড়াটা।

'হাল্লো, আরনি,' স্বাগত জানাল কিশোর। 'কেমন আছেন?'

'ভাল না, কিশোর। তোমাকে সাবধান করতে এলাম।'

'কি হয়েছে?' বুকের মধ্যে কাঁপুনি উঠে গেল কিশোরের।

'অদ্ভুত এক রোগ। গরুর। পাগল করে দিচ্ছে জানোয়ারগুলোকে। গতকাল ফ্রেঞ্চরা ওদের ছয়টা গরুকে গুলি করে মারতে বাধ্য হয়েছে। আমরা মেরেছি আজকে তিনটাকে।'

'বলেন কি!'

'হ্যাঁ, তাই।'

'কিন্তু আমাদেরগুলোর তো এখনও কিছু হতে দেখলাম না,' বলে বারান্দা থেকে নামল কিশোর। 'অসুস্থ যে সেটা কিভাবে বোঝা যাবে?'

ঘোড়া থেকে নামল আরনি। 'চলো, তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছি।'

বাড়ির পেছনে আরনিকে নিয়ে এল কিশোর। পায়ের শব্দে মুখ ফিরিয়ে দেখল হেনরিও এসেছে পেছন পেছন। তার দিকে তাকিয়ে হাসল কিশোর।

'আমাদের তো আছেই মাত্র ক'টা গরু,' কিশোর বলল। 'ওখানটায় ছেড়ে রেখেছি চরে খাবার জন্যে। গোয়ালে আর নিই না।'

নিচু হয়ে একটা গরুর শিং চেপে ধরল আরনি। মাথা ঝাড়া দিয়ে ছাড়ানোর চেষ্টা করতে লাগল গরুটা। ডাকতে শুরু করল। কিন্তু শক্ত করে ধরে রাখল আরনি। একবার এপাশে, একবার ওপাশে কাত করে গরুর মুখটা দেখল।

'কি দেখছেন?' জানতে চাইল কিশোর। হাঁটু মুড়ে বসেছে গরুটার মুখের কাছে। তার পাশে বসে হেনরিও তাকিয়ে আছে কৌতূহলী চোখে।

'অসুস্থ হলে নাক দিয়ে সবুজ গ্যাঁজলা বেরোয়,' আরনি বলল। 'তারপর লাল হয়ে যায়। যন্ত্রণায় পাগল হয়ে ওঠে গরুগুলো।'

'খুব খারাপ রোগ মনে হচ্ছে,' কিশোর বলল।

'খারাপ না হলে কি আর নিজের গরু গুলি করে মারতে হয়। এ রকম রোগের কথা কেউ কখনও শোনেনি। গাঁয়ের লোকে ভাবছে, অশুভ কোন কিছুর ছায়া পড়েছে গাঁয়ে।' কিশোরের দিকে তাকাল আরনি, 'তোমাদের গরুগুলো তো ভালই আছে দেখছি।'

'এখনও আছে। হতে কতক্ষণ। ভালমত খেয়াল রাখতে হবে। একটা গরু খোয়ালেও মস্ত ক্ষতি হয়ে যাবে আমাদের।'

ফিরে যাওয়ার জন্যে ঘুরতে গিয়েই বরফের মত জমে গেল যেন আরনি। আতঙ্কে ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইছে চোখ।

কি দেখে এমন হলো আরনির দেখার জন্যে তাকাল কিশোর। পেছনের আঙিনায় একটা নেকড়েকে মুখে তুলে মাংস খাইয়ে দিচ্ছে সিসি।

অস্ফুট একটা শব্দ করে পিছিয়ে গেল আরনি। 'সিসি, সাবধান! ওটা নেকড়ে! কুকুর নয়!' হেনরিকে দেখিয়ে কিশোরকে বলল, 'বাচ্চাটাকে ঘরে ঢোকাও। বন্দুক নিয়ে এসো।'

'ও কিছু না। ভয় পাবেন না,' আরনিকে আশ্বস্ত করতে চাইল কিশোর। 'জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে সহজেই খাতির করে ফেলতে পারে সিসি। নেকড়েটা ওর কিছু করবে না।'

কিন্তু শঙ্কামুক্ত হতে পারল না আরনি। 'কিন্তু ওটা নেকড়ে! গত বছর আমাদের অনেকগুলো গরু-ছাগল মেরে ফেলেছিল নেকড়েতে...আমি...আমি যাই...'

দৌড়ে আঙিনা পার হয়ে গেল আরনি। মিনিটখানেক পরেই ওর ঘোড়ার ছুটন্ত পদশব্দ কানে এল কিশোরের। গরুগুলো বাঁ-বাঁ করে হাঁক ছাড়ল কয়েকটা। তারপর নাক ঝাড়তে লাগল।

উঠে এসে একটা গরুর কপালে হাত রাখল সিসি। লম্বা জিভ বের করে ওর কনুই চেটে দিল গরুটা।

'আরনি এসেছিল কেন?' জিজ্ঞেস করল সিসি।

'গরুর নাকি কি এক আজব রোগ হচ্ছে,' কিশোর বলল।

মুখটা উঁচু করে ধরল সিসি। বাধা দিল না গরুটা। আরনি

ধরাতে যেমন করেছিল, তার কিছুই করল না, চুপচাপ দেখতে দিল সিসিকে।

'নাহ্, আমাদেরটা সুস্থই আছে,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল সিসি। জন্তু-জানোয়ারের দুঃখ-যন্ত্রণা ওদের মত করেই বুঝতে পারে।

'আরনিও বলছিল ভালই আছে,' কিশোর বলল। 'কিন্তু নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না। তুমি যখন বলছ কিছু হয়নি, তারমানে সত্যি হয়নি, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম।'

'ও ভাল থাকবে,' গরুটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সিসি। 'আমাদের একটা গরুরও কিছু হবে না।'

'না হলেই ভাল। এখন একটা গরু খোয়ানো মানে আমাদের বিরাট ক্ষতি। পাড়া-পড়শীদের গরুগুলোকে যে ভাবে গুলি করে মারতে হচ্ছে...'

'তার জন্যে কি দুঃখ হচ্ছে তোমার?' প্রচণ্ড রাগ ঝিলিক দিয়ে উঠল সিসির চোখে। 'মরুক না! সব মরে সাফ হোক শয়তানদের!'

'কি বলছ তুমি, সিসি!'

'ঠিকই বলছি। যেমন পাজী, ওদের শাস্তি হওয়াই উচিত। ওরা বলে আমি নাকি ডাইনী!'

আট

সেই শনিবারে হেনরি আর সিসিকে নিয়ে শহরে গেল কিশোর, দোকান থেকে জিনিস কিনে আনতে। সপ্তাহের এ দিনটিতে

এলাকার সমস্ত চাষী বাজার করতে আসে। লোকে গমগম করে শহরটা।

কিন্তু সে দিন লোকের ভিড় দেখা গেল না মোটেও। কাঠের সাইডওয়াক ধরে হাতে গোণা কয়েকজন লোক হেঁটে যাচ্ছে। কেমন ভুতুড়ে নিস্তব্ধতা। পুরো শহরই যেন শোক পালনে রত।

রনসন'স জেনারেল স্টোরের দরজা ঠেলে খুলল কিশোর। পাল্লার ওপরে লাগানো ঘণ্টা বেজে উঠে জানান দিল দোকানে খরিদ্দার ঢুকেছে। শব্দটা অনেক বেশি জোরাল মনে হলো কিশোরের কাছে। কারণ ভেতরে খরিদ্দারের ভিড় নেই, কোলাহল নেই। জুতোর শব্দ তুলে লোহাকাঠের পাটাতনের ওপর দিয়ে হেঁটে গেল কিশোর। তাকে অনুসরণ করল সিসি আর হেনরি।

স্টোররুমের পর্দা সরিয়ে দোকানে ঢুকলেন মিস্টার রনসন। হাসলেন। 'গুড ডে, কিশোর। তারপর, কেমন আছ তোমরা?'

'আছি ভালই,' জবাব দিল কিশোর। 'শহরটা এমন নীরব কেন?'

'সারা হপ্তা ধরেই নীরব,' রনসন জানালেন। 'গরুর রোগ নিয়ে মহা দুশ্চিন্তায় আছে লোকে। রোগ সারানোর সব রকম চেষ্টা করছে। কোন লাভ হচ্ছে না। তুমি ক'টাকে গুলি করলে?'

'একটাও না।'

চোখ বড় বড় হয়ে গেল মিস্টার রনসনের। 'বলো কি! কি খাইয়ে রোগ সারালে?'

'আমাদের গরুর রোগই হয়নি।'

সন্দেহ জাগল মিস্টার রনসনের চোখে। 'কেন হচ্ছে না বুঝতে পারছ কিছু?'

'কেন আবার। আমাদের ভাগ্য ভাল।'

সিসির দিকে দৃষ্টি সরে গেল মিস্টার রনসনের। 'হবে হয়তো।...ভাগ্য ভাল, নাকি অন্য কিছু?'

'অন্য আর কি হবে?'

'হুঁ!' আনমনে মাথা ঝাঁকালেন মিস্টার রনসন। 'অবস্থাটা এমনই এখানকার, কারোরই মন-মেজাজ ভাল নেই। তা কি লাগবে তোমাদের?'

'কিছু চিনি আর ময়দা,' কিশোর বলল। 'আর সামান্য টিনের খাবার।'

পকেট থেকে তার শেষ সম্বল নোটের তাড়াটা বের করে আনল কিশোর। এক হাজার পেসো কাউন্টারে রেখে ঠেলে দিয়ে বলল, 'এতে যা হয়, দিন।'

'দাঁড়াও, বাক্সে ভরে দিচ্ছি।'

কাউন্টারের ওপাশে নিচু হয়েই স্থির হয়ে গেলেন তিনি। কণ্ঠস্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'এই, তোমরা সরে যাও ওখান থেকে!'

কাউন্টারের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে দিল সিসি। দেখল, একটা বাক্স উঁচু করে ধরে রেখেছেন মিস্টার রনসন।

'কি হয়েছে, মিস্টার রনসন?' জিজ্ঞেস করল সে।

'সাপ,' ফিসফিস করে জবাব দিলেন মিস্টার রনসন। 'এত বড় সাপ জীবনে দেখিনি। জলদি গিয়ে দেখো বাইরে কার কাছে বন্দুক আছে।'

কিশোর বাধা দেয়ার আগেই কাউন্টার ঘুরে অন্যপাশে চলে গেল সিসি। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সাপটার কাছে। 'ঘাবড়াবেন না, মিস্টার রনসন। ও আপনাকে কিছু করবে না।'

আস্তে হাতটা বাড়িয়ে দিল সিসি। ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়ে কিশোর দেখল, বিশাল সবুজ সাপটা ধীরে ধীরে সিসির হাত বেয়ে উঠে আসছে কাঁধের দিকে। ওর গলায় পেঁচিয়ে গেল মালার মত। শয়তানি ভরা কালো চোখের চাহনি সিসির ওপর স্থির। চেরা মাথাওয়ালা লাল জিভটা ঘন ঘন বেরিয়ে আসছে মুখের ভেতর থেকে।

হ্যাঁচকা টানে হেনরিকে নিজের পেছনে নিয়ে গিয়ে আড়াল

করে রাখল কিশোর। সাপটার বাঁকা বড় বড় বিষদাঁতের দিকে তাকিয়ে শুকিয়ে গেল গলা। ঢোক গিলল বড় করে।

সাপটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল সিসি। ফোঁস ফোঁস করছে ওটা। কিশোরের চোখে চোখ রাখল সিসি। 'ভয় নেই, কিশোরভাই, ওটা আমাকে কিছু করবে না। বাড়ির কাছে গিয়ে বনে ছেড়ে দেব।'

কাউন্টারের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল সিসি। সাপের লম্বা লেজটা ঝুলে আছে ওর পিঠের ওপর। হাত বাড়িয়ে লেজের ডগাটা ছুঁয়ে দেখল হেনরি। কিশোর ওসব কিছুই করতে পারল না। ভয়ে কেঁপে উঠল সে। জানে, বনের জানোয়ারের সঙ্গে ভাব করতে এক মুহূর্তও লাগে না সিসির। কিন্তু তাই বলে এতবড় একটা বিষাক্ত সাপকে গলায় পেঁচিয়ে রাখা!

পাথরের মূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার রনসন। কাঁপছেন থরথর করে। 'দোকান বন্ধ করে দিচ্ছি আমি,' কম্পিত স্বরে বললেন।

'আমাদের জিনিসগুলো?' কিশোর বলল।

'আরেক দিন এসে নিও।'

কাউন্টারে রাখা মুদ্রাটা হাত দিয়ে টেনে সরিয়ে আনল কিশোর। তুলে নিয়ে পকেটে ভরল। হতাশ কণ্ঠে বলল, 'সিসি। হেনরি। চলো, যাই।'

দোকান থেকে বেরিয়ে এল ওরা। দড়াম করে মিস্টার রনসনকে পাল্লা লাগাতে শুনল। তালা আটকে দিলেন তিনি।

রাস্তা ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় পথচারীদেরকে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখল কিশোর। সবার চোখ সিসির গলার সাপটার দিকে। একটা বাড়ির জানালা দিয়ে তাকিয়ে ছিল এক মহিলা। ঝট করে পর্দা টেনে দিল। দেখেও দেখল না সিসি। আপনমনে হেঁটে চলল।

হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিল কিশোর। যত তাড়াতাড়ি বনের

কাছে পৌঁছানো যাবে, সাপটাকে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারবে।

*

সেদিন রাতে। লাফ দিয়ে বিছানায় উঠে বসল কিশোর। দ্বিধায় পড়ে গেছে। ঘুম ভাঙাল কিসে?

শব্দটা কানে এল আবার। একজন মানুষের কণ্ঠ। খসখসে। ক্রুদ্ধ।

একজন নয়। আরও মানুষের কথা বলার শব্দ কানে আসতে লাগল।

ঘোড়ার খুরের ভোঁতা শব্দ শোনা গেল। বুকের মধ্যে হাতুড়ির বাড়ি পড়া শুরু হলো যেন তার।

জোরাল হতে লাগল খুরের শব্দ।

এগিয়ে আসছে।

তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নেমে শার্টটা গায়ে দিল। ওপরে চাপাল ওভারঅল।

কারা আসছে? কি চায়?

জানালার কাছে দৌড়ে এল সে। বাইরে ঘন কালো রাতের অন্ধকার। ঘোড়ার তীক্ষ্ণ ডাক কানে এল। সেই সঙ্গে মানুষের রাগত চিৎকার।

দেখতে পেল লোকগুলোকে। বাড়ি ঘিরে চক্কর দিচ্ছে। শিকার কোণঠাসা করা নেকড়ের পালের মত।

জিভ শুকিয়ে সিরিশ কাগজের মত হয়ে গেল কিশোরের। চাঁদিটা দপদপ করতে লাগল। নিচে নামার সিঁড়ির দিকে দৌড় দিল সে।

সামনের পারলারের একধারে দেয়ালে ঝোলানো লং হার্টের রাইফেলটা হুক থেকে খুলে নিল। ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

সিঁড়ি বেয়ে ছুটে নেমে এল নিচের বারান্দায়। দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে দেখার চেষ্টা করল অন্ধকারে। অস্পষ্ট দেখতে পেল রাস্তা দিয়ে ছুটে চলে যাচ্ছে কয়েকটা বড় বড় ছায়া। ছুটন্ত ঘোড়ার খুরের

শব্দটা কেবল স্পষ্ট।

বারান্দা থেকে নেমে এল কিশোর। চাঁদের ওপর থেকে সরে গেল কালো মেঘের ঢাকনা। বড় একটা জিনিসকে পড়ে থাকতে দেখল আঙিনায়।

দৌড়ে এল কাছে। প্রচুর রক্তের মাঝখানে বেকায়দা ভঙ্গিতে পড়ে আছে একটা গরু। একরাশ অভিযোগ নিয়ে যেন কিশোরের দিকে স্থির তাকিয়ে রয়েছে নিষ্প্রাণ চোখ দুটো।

নয়

চিৎকার করে উঠল কিশোর। রাগ যেন টগবগ করে ফুটতে লাগল মগজে। খুনীকে এখন সামনে পেলে নির্দ্বিধায় গুলি করে বসত। গরুটার লম্বা লাল জিভ বেরিয়ে এসেছে মুখের ভেতর থেকে। গলা থেকে চুইয়ে পড়ছে এখনও রক্ত।

মর্মান্তিক দৃশ্যটা সইতে না পেরে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়াতে গেল কিশোর। গরুর মুখের মধ্যে একটা জিনিস দৃষ্টি আকর্ষণ করল তার। একটা কাগজ দলা পাকিয়ে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে মুখের ফাঁকে।

গরুর মুখে কাগজ কেন? হাত বাড়াল কিশোর। লালা আর রক্ত মাখা জিভটায় আঙুল লাগতেই ঝটকা দিয়ে সরিয়ে আনল। অনুভূতিটা ভয়ঙ্কর। সাবধানে আবার হাত বাড়িয়ে খুলে আনল কাগজটা। চাঁদের আলোয় খুলে দেখল লেখা রয়েছে:

আমাদের গরু মেরেছ, তোমাদের গরু মারলাম।
মেয়েটাকে ঠেকাও।

তুমি না পারলে আমরা ঠেকাব।

বোকা হয়ে লেখাটার দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। ওরা ভাবছে, গরুর মড়ক লাগার পেছনে সিসির হাত আছে। কি অসম্ভব ভাবনা!

মরা গরুটার দিকে তাকাল সে। গরুটাকে জবাই করে রেখে গেছে ওরা। সিসিকেও কি খুন করতে আসবে!

দ্রুত ঘরের দিকে ফিরল কিশোর। সিসির কিছু হয়েছে কিনা দেখার জন্যে। সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সে। সাদা লম্বা নাইটগাউনের ঝুল উড়ছে বাতাসে। বেণী খুলে ফেলায় কালো চুলের বোঝা এলোমেলো ভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সারা কাঁধে। সুন্দরী, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইল কিশোর। চাঁদের আলোয় বাতাসে দুলন্ত গাউনটাকে অদ্ভুত লাগছে। মুখের ভঙ্গিটাও যেন কেমন।

বোনের পাশে দাঁড়ানো হেনরি। দুই হাত আড়াআড়ি রাখা বুকের ওপর। হেনরির সবুজ চোখ বিস্ফারিত। ঠোঁট কাঁপছে। ভাইয়ের কাঁধে একটা হাত রেখে তাকে সাহস জোগানোর চেষ্টা করছে সিসি।

'আর কোন ভয় নেই,' অন্যদিকে তাকিয়ে বলল কিশোর। 'ওরা চলে গেছে।' সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় উঠল সে। বন্দুকটায় হাত বোলাল। 'আবার এলে সোজা গুলি মেরে দেব।'

'কাগজটায় কি লেখা?' জানতে চাইল সিসি।

'ও কিছু না...' দেখলে ঘাবড়ে যাবে ভেবে দেখাতে চাইল না কিশোর। তাড়াতাড়ি কাগজটা পকেটে রেখে দিতে গেল।

কিন্তু কাগজটা কেড়ে নিল সিসি। পড়তে পড়তে চোয়াল শক্ত হয়ে গেল।

'কি করে ভাবতে পারছে ওরা!' কেঁদে ফেলল সিসি। কাগজটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল উঠানে।

কিশোরের দিকে মুখ তুলে তাকাল সে। চাঁদের আলোতেও ওর চোখের রাগ স্পষ্ট দেখতে পেল কিশোর।

'ওরা ভাবছে আমি অশুভ কিছু!' চিৎকার করে উঠল সিসি। 'জাহান্নামে যাক সব! মরুক! আমি ওদের ঘৃণা করি!'

*

দু'দিন পর। অনিচ্ছুক খচ্চরটার পেছন পেছন ভারী হাল ঠেলে নিয়ে এগোচ্ছে কিশোর, এই সময় দেখতে পেল গ্যারিবাল্ডকে। মুখটাকে আষাঢ়ের মেঘের মত গোমড়া বানিয়ে ভারী পায়ে হেঁটে আসছে খেতের ওপর দিয়ে।

খচ্চরটাকে থামাল কিশোর। পকেট থেকে রুমাল বের করে ভুরুর ওপরের ঘাম মুছল।

কাছে এসে দাঁড়াল গ্যারিবাল্ড। পেছনে ঠেলে দিল হ্যাটটা। ভূমিকার মধ্যে না গিয়ে সরাসরি বলল, 'কিশোর, আগেই সাবধান করা হয়েছিল তোমাকে। সাফ কথা বলো, আজকের মধ্যে টাকা দিতে পারবে কিনা?'

ঢোক গিলল কিশোর। 'আমার কাছে মাত্র বিশ হাজার পেসো আছে। ফসল না উঠলে কোনমতেই আর একটা পয়সাও জোগাড় করতে পারব না।'

কাশি দিয়ে গলা পরিষ্কার করল গ্যারিবাল্ড। চোখ নামিয়ে বলল, 'বেশ, ওটা আমি নিয়ে যাচ্ছি। আপাতত বাড়ি থেকে আর বিদেয় করলাম না তোমাদের।'

পকেট থেকে নোটগুলো বের করল কিশোর। ফেলে দিল গ্যারিবাল্ডের ছড়ানো তালুতে। ভারী চাপ অনুভব করছে বুকের মধ্যে। কিছুই রইল না আর তার কাছে। তিনজন মানুষের কি করে চলবে! ভয়ানক দুর্ভাবনাটা জোর করে তাড়াল মাথা থেকে।

নোটগুলোর ওপর শকুনের নখের মত বাঁকা হয়ে চেপে বসল গ্যারিবাল্ডের আঙুল। হাতটা ঢুকে গেল কোটের পকেটে। ভঙ্গি দেখে প্রচণ্ড রাগ যেন দলা বেঁধে উঠে আসতে শুরু করল

কিশোরের গলা বেয়ে।

'তোমাদের জানোয়ারগুলো সব সুস্থ আছে?' জিজ্ঞেস করল গ্যারিবাল্ড।

'আছে।'

'ফ্রেঞ্চদের ভাগ্য অতটা ভাল নয়। গাঁয়ের সবাই অবাক। সবার গরু মরছে, তোমাদের মরে না কেন?'

'জানি। রাতের বেলা চোরের মত এসেছিল ওরা। সিসিকে খুন করার হুমকি দিয়ে গেছে।'

'এ ভাবে গরু যদি মরতেই থাকে, সিসিকে সত্যিই খুন করবে ওরা; কেউ ঠেকাতে পারবে না।'

'কিন্তু সিসি কি ওদের গরু মারছে নাকি?' রাগটা দমন করা কঠিন হয়ে যাচ্ছে কিশোরের পক্ষে। 'গরু মরছে রোগে। দোষটা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সান্ত্বনা পেতে চাইছে হদ্দ বোকাগুলো।'

হ্যাটটা টেনে সোজা করে বসাল গ্যারিবাল্ড। 'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করলেও, কিশোর, গাঁয়ের অন্য কেউ করবে না।'

দশ

কিশোরের যখন এই দুর্গতি, রিটার তখন অন্য ঘটনা। রবিনদের লিভিং-রূমে ডায়েরী পড়ে সেই ঘটনার কথাই জানছে রবিন। গভীর আগ্রহে শুনছে মুসা আর জিনা।

পোশাকের দোকানটাতে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে–রিটা লিখেছে।

জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকাল ক্লডিয়া। 'চুরি করে পালাচ্ছিলে, তাই না? মজা টের পাবে। চোরের জন্যে কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা আছে আমাদের।'

'কি বলছেন?' চমকে গেলাম। 'চোর হতে যাব কেন আমি?'

'চোর নও তো কি?' আঙুল তুলল ক্লডিয়া। 'তোমার গায়ে এখনও পরাই আছে ব্লাউজটা। নিয়ে পালাচ্ছিলে, আবার বলছ চোর নও!'

ব্লাউজটার দিকে তাকালাম। ধীরে ধীরে মাথায় ঢুকল ঘটনাটা কি ঘটেছে। ব্লাউজ সহ দোকানের বাইরে ধরেছে আমাকে ওরা। না বলে জিনিস নিয়ে বেরিয়েছি। চুরিই তো। কিন্তু আসলে তো আমি চুরি করিনি। বোঝাতে গেলাম, 'দেখুন...' বলেই চুপ হয়ে গেলাম। কি বলব? সময় পেরিয়ে অন্য সময়ে চলে গিয়েছিলাম! বিশ্বাস করবে?

'চুপ হয়ে গেলে কেন?' ধমকে উঠল ক্লডিয়া।

'দেখুন, জিনিসটা কিনতেই তো চেয়েছিলাম আমি,' জবাব দিলাম। 'নাহয় বাইরে থেকেই ধরে আনা হয়েছে আমাকে। তাতে কি হয়েছে? দাম দিয়ে দিচ্ছি। জিনিসটা আমার হয়ে গেল। ব্যস, ঝামেলা খতম।'

'উঁহু, তা হবে না,' মাথা নাড়ল ক্লডিয়া। 'সবাই সুযোগ পেয়ে যাবে তাহলে। পকেটে টাকা নিয়ে এসে জিনিস চুরি করবে। ধরা পড়লে বলবে, দাম দিয়ে দিচ্ছি। একটা উদাহরণ তৈরি করে রাখা দরকার। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। চুরি করার আগে যাতে দশবার ভাবে কেউ...'

'ভাল করে তাকিয়ে দেখুন তো, আমাকে কি চোর বলে মনে হচ্ছে?'

'ভদ্র চেহারার আড়ালেই চুরি করা সহজ,' কঠোর জবাব দিল ক্লডিয়া। প্রহরীদের বলল, 'এই, সিকিউরিটি অফিসে নিয়ে যাও একে।'

*

জঘন্য কথা বলল আমাকে সিকিউরিটি-ইন-চার্জ। বার বার 'চোর' বলে অপমান করল। বাবাকে খবর দিল।

আমার বাবা একজন সম্মানিত লোক, ভাল মানুষ, যে কেউ পছন্দ করবে তাকে। জন হপকিনস ইউনিভার্সিটি থেকে সাইকোলজিতে ডিগ্রি নিয়ে এখন মানসিক রোগের চিকিৎসা করেন। টাকার সমস্যা নেই। তাঁর মেয়ে হয়ে আমি এ ধরনের অপরাধ করতেই পারি না। এ সব বলে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করলাম ইন-চার্জকে। বুঝল তো না-ই, বরং ধমক দিল। আমার বাবার নাম নিয়ে ব্যঙ্গ করে বলল, মানুষের রোগ সারাতে যাওয়ার আগে নিজের মেয়ের চিকিৎসা দরকার ছিল।

এত রাগ লাগল, কোন কথাই বলতে গেলাম না আর। একেবারে চুপ মেরে গেলাম। এদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। বাবার আসার অপেক্ষায় রইলাম।

বাবা এল। নির্বিকার ভঙ্গিতে সিকিউরিটি-ইন-চার্জের সব কথা শুনল। কোন প্রতিবাদ করল না। আমার পক্ষে কোন সাফাই গাইতে গেল না। ইন-চার্জের কথা শেষ হলে শান্ত ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, 'কি করতে চান এখন? ওর বিরুদ্ধে কেস করবেন? আমার উকিলকে ফোন করব?'

'না, এতটা নিচে নামব না আমরা,' ইন-চার্জ বলল। 'অনেক কিছুই করতে পারতাম, কিন্তু আপনি সম্মানী লোক বলে ছেড়ে দিচ্ছি। পুলিশকে আর ডাকাডাকি করলাম না।' বাবার দিকে চেয়ে কঠিন হাসি হাসল লোকটা। 'তবে, এ ধরনের কাজ করতে যাতে আর কেউ সাহস না পায়, সে-জন্যে একটা ব্যবস্থা করে রাখা দরকার।'

*

আমার কয়েকটা ক্লোজআপ ছবি তুলে রেখে, বেশ কিছু সারগর্ভ উপদেশ দিয়ে বাবা সহ আমাকে বিদায় দিল সিকিউরিটি-ইন-

চার্জ।

ছবি তোলায় আতঙ্কিত বোধ করলাম। কি করবে? পোস্টারে আমার ছবি ছেপে চোর আখ্যায়িত করে লাগিয়ে দেবে মলের দেয়ালে দেয়ালে? অন্য দোকানদারদের সাবধান করে দেবে?

সর্বনাশ হবে! এই মলে ঢোকার এখানেই ইতি। রকি বীচেও টিকতে পারব কিনা সন্দেহ। স্কুলের সব ছেলেমেয়েরা জেনে যাবে, শিক্ষকরা জানবে, পাড়া-পড়শীরা জানবে; হাত তুলে দেখাবে আর হাসাহাসি করবে—ওই যে চোর্‌নি রিটা যায়! কোনমতেই সহ্য করতে পারব না। এতক্ষণ এত গালাগাল অপমানেও যা হয়নি, তা-ই হলো, চোখ ফেটে পানি এল আমার। যে অপরাধটা আমি করিনি তার জন্যে এতবড় শাস্তি আমাকে না দিলেও পারত ওরা।

আমার হাত ধরে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল বাবা। আকাশ কালো মেঘে ঢেকে গেছে। পার্কিং লটের চত্বর ধরে গাড়ির দিকে এগোলাম। কিছুদূর যেতে না যেতেই বিকট শব্দে বাজ পড়ল। গাড়িতে পৌঁছতে পৌঁছতে ভিজে চুপচুপে হয়ে গেলাম।

গাড়ি স্টার্ট দিচ্ছে বাবা। এতক্ষণে কথা বলার সুযোগ পেলাম, 'বাবা, ব্লাউজটা আমি চুরি করিনি।'

'থাক, ও নিয়ে আর আলোচনার দরকার নেই। দোষটা আমারই। বাবার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করিনি আমি।'

'বাবা, সত্যি বলছি, ওটা আমি চুরি করিনি! বিশ্বাস করো!'

'যা হবার হয়ে গেছে। এখন থেকে আরও বেশি সময় দেব তোমাকে।' আমার হাতে চাপ দিল বাবা।

'বাবা, তুমি আমার কথা শুনছ না! আমি বলছি, আমি চুরি করিনি। সব দেখেশুনে চুরিই মনে হতে পারে, কিন্তু যা ঘটেছে সেটা সাংঘাতিক।'

পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে নীরবে কয়েক মিনিট গাড়ি চালাল বাবা। ভীষণ অস্বস্তিতে ভুগতে থাকলাম আমি। অবশেষে বাবা বলল, 'বেশ, বলো, কি ঘটেছে। আমি শুনছি।'

ভেজা চুলে হাত বোলালাম। ঠোঁট কামড়ালাম। বাবাকে সব কথা বলি আমি, কোন কিছু গোপন করি না। বাবা আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু। আমাকে বিশ্বাস করে। কিন্তু আজকের ঘটনাটা কি করবে?

'বাবা, যে কথাটা আমি বলব এখন, কথা দিতে হবে চুপ করে শুনবে। কথার মাঝখানে কোন মন্তব্য করবে না। কোন পরামর্শ দেবে না।'

'ঠিক আছে, কথা দিলাম।'

'ঘটনাটা হলো...' ঢোক গিললাম। দ্বিধা যাচ্ছে না আমার। শেষমেষ বলেই ফেললাম, 'বাবা, আমি সময় পেরিয়ে চলে গিয়েছিলাম।'

মাথা ঝাঁকাল বাবা, 'বলো, আমি শুনছি।'

'বাবা, ব্লাউজটা পরে দেখার জন্যে চেঞ্জিং রুমে ঢুকেছিলাম। হঠাৎ আলোগুলো মিটমিট শুরু করল। বিচিত্র শব্দ হতে লাগল। আবার আলো জ্বললে যখন বেরিয়ে এলাম, আমি এক ভিন্ন জগতে চলে গিয়েছি। বাবা, সেটা উনিশশো সাতাশি সাল।'

বাবাকে বিশ্বাস করতে বলছি, অথচ তখনও আমার নিজেরই বিশ্বাস হচ্ছে না, সত্যি সত্যি আমি অন্য সময়ে চলে গিয়েছিলাম।

'উনিশশো সাতাশি? তেরো বছর আগে?'

'হ্যাঁ, বাবা।' আমার কথা বিশ্বাস করছে কিনা বুঝতে পারলাম না। 'রাস্তার মোড়ের বিখ্যাত সেই অ্যামোজ কুকিস স্ট্যান্ডটা, যেটাতে প্রায়ই আমরা কুকিস কিনতে যেতাম...'

'এক সেকেন্ড,' রাস্তা থেকে মুহূর্তের জন্যেও নজর সরাচ্ছে না বাবা। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। বাতাসে শুকনো-শ্যাওলা-ভেজা গন্ধের মত গন্ধ, গরমকালে বৃষ্টির সময় যা হয়। বেশি স্পীডে চালানোর সময় কথা বললে অ্যাক্সিডেন্ট করতে পারে, তাই গতি কমাল বাবা। 'হ্যাঁ, এবার বোঝার চেষ্টা করে দেখা যাক, এ ধরনের কল্পনা কেন করতে গেলে তুমি।'

দমে গেলাম। 'অ, তারমানে তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না! তুমি ভাবছ, মিথ্যে কথা বলছি!'

'আমি কি বলেছি, মিথ্যে বলছ? সত্যি কথাই বলছ তুমি,' ডাক্তারী-কণ্ঠে বলল বাবা, ফোনে রোগীদের সঙ্গে এ ভঙ্গিতে কথা বলতে বহুবার শুনেছি। 'অনেক সময় কিছু কিছু ঘটনা একেবারে বাস্তব মনে হয়, কিন্তু আসলে সেগুলো বাস্তব নয়। মন আমাদের সঙ্গে চাতুরি করে। কল্পনা বাস্তবতাকে দাবিয়ে দেয়।'

'হা কপাল!' বিড়বিড় করলাম। 'কেউ আমার কথা বুঝছে না, বিশ্বাস করছে না, এমনকি আমার সবচেয়ে বড় বন্ধুটিও নয়। কেউ না! কেউ না!'

'রিটা,' বাবা জবাব দিল, 'সত্যিই বলেছ, আমি তোমার এত ঘনিষ্ঠ, এত কাছের মানুষ হয়েও পুরোপুরি বুঝতে পারিনি তোমাকে। কি করে বুঝব? আমি তো আর তোমার বয়েসী কিশোরী ছিলাম না কখনও। সেটা তোমার মা হলে পারত।...উনিশশো সাতাশি বললে না? এই সালটাই আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। তোমার মা মারা গিয়েছিল ওই বছর। আজকে তোমার জন্মদিন। এই দিনে মাকে তোমার খুব দেখতে ইচ্ছে করবে, এটাই স্বাভাবিক।'

'তারমানে,' ধীরে ধীরে বললাম, 'তুমি বলতে চাও, মাকে দেখার ইচ্ছে আমার এতটাই বেড়ে গিয়েছিল, কোনভাবে সময়কে ডিঙিয়ে পেছনে চলে গিয়েছিলাম?'

'না, ঠিক তা নয়। তবে মাকে দেখতে এতই ইচ্ছে করছিল, তোমার মনে হয়েছে তোমার মায়ের বেঁচে থাকার সময়টায় চলে গেছ।'

'তারমানে এখনও তুমি আমার কথা বিশ্বাস করছ না!' কান্না এসে যাচ্ছিল আমার, জোর করে ঠেকালাম। বাবার দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। বড় বড় ফোঁটা ক্রমাগত আঘাত হানছে জানালার কাঁচে।

'আমি বিশ্বাস করি বা না করি, রিটা,' বাবা বলল, 'সত্যিই যদি তুমি পিছিয়ে চলে গিয়ে থাকো, সাংঘাতিক ভাগ্য বলতে হবে তোমার। কতবার আমি পিছিয়ে যেতে চেয়েছি সেই সময়টাতে···কিন্তু কখনও পারিনি।'

হঠাৎ করেই বাবার জন্যে বড় মায়া লাগল। বেচারা! মাকে অসম্ভব ভালবাসত। মা'র কথা মনে হলে ভীষণ কষ্ট পায়। আস্তে করে হাত বাড়িয়ে তার কাঁধে রাখলাম। পাশে কাত হয়ে আমার মাথায় চুমু খেল বাবা।

ঘুরে পেছনে তাকালাম। পেছনের সীটে রাখা লাল কাগজে মোড়া একটা বড় বাক্স। 'ওটা আমার জন্মদিনের কেক, তাই না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল বাবা। 'মল থেকে যখন ফোন পেলাম, তখনই বুঝতে পারলাম তোমার মনের অবস্থা কি হবে। তোমাকে খুশি করার জন্যে কেকটা কিনে নিয়েছিলাম।'

বললাম না, পৃথিবীতে আমার বাবা আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু!

'কি বলে যে তোমাকে ধন্যবাদ দেব, বাবা,' নাক টানলাম। ঠাণ্ডাটা ধরতে আরম্ভ করেছে মনে হয়। 'আমি সত্যিই এখন খুশি।'

বুনো অঞ্চলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছি তখন। গাড়ির ছাতে তবলা বাজাচ্ছে বৃষ্টির ফোঁটা। কুয়াশা এত ঘন হয়ে গেছে, সামনে পনেরো ফুট দূরেও দৃষ্টি চলে না।

আর ঠিক এই সময় ঘটল অঘটনটা।

এগারো

দম নেয়ার জন্যে থামল রবিন।

কিন্তু চুপ থাকতে দিল না তাকে মুসা আর জিনা।

'থামলে কেন?' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'পড়ো পড়ো! তারপর?'

'অঘটনটা কি?' জিনাও উত্তেজিত। 'পড়ো জলদি!'

কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে রবিনের। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে মুছে নিয়ে আবার পড়তে শুরু করল:

চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেল গাড়ির ইঞ্জিন। চুপ হয়ে গেল রেডিও। বাতি নিভে গেল। যেন চলতে চলতে মরে গেল গাড়িটা।

কোনমতেই স্টার্ট করতে না পেরে বৃষ্টির মধ্যেই ছাতা আর টর্চ হাতে নেমে গেল বাবা। হুড তুলে খানিকক্ষণ ইঞ্জিনের এটা-ওটা নাড়াচাড়া করল। চালু করতে পারল না।

ফিরে এসে ড্রাইভিং সীটে বসল বাবা। 'আশ্চর্য! মনে হচ্ছে কেউ যেন ব্যাটারির সমস্ত শক্তি শুষে নিয়েছে। অলটারনেটর ঠিক, কোন লীকটিক নেই···'

'বজ্রপাতের জন্যে নয় তো?' জিজ্ঞেস করলাম।

'হতে পারে···কিংবা ভিনগ্রহবাসীর মহাকাশযান,' রসিকতা করল বাবা। ইদানীং রকি বীচের বাসিন্দারা কিভাবে ইউ এফ ও নিয়ে মেতে উঠেছে, জানা আছে তার।

'দূর, ইউ এফ ও না ছাই। আকাশে তো কোন আলোই দেখছি না।···কি করব এখন?'

'কাছেই একটা গ্যাস স্টেশন আছে। মেকানিক আছে কিনা

দেখতে পারি গিয়ে। তুমি গাড়ির মধ্যে বসে থাকো। গাড়ি পাহারা দাও। নেকড়েরা ঘিরে ধরলেও গাড়ি থেকে বেরোবে না।'

এই শেষ কথাটাও বাবার রসিকতা। একটা সিনেমায় বনের মধ্যে গাড়ি খারাপ হয়ে যাওয়ায় ছবির বাবাকে বেরোতে হয়েছিল তার মেয়েকে রেখে। নেকড়েরা ঘিরে ধরেছিল গাড়িটা। ভয়ে গাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটে পালাতে চেয়েছিল মেয়েটা। মর্মান্তিক পরিণতি ঘটে তার।

কথাটা মনে করিয়ে বাবা বরং ভয় ধরিয়ে দিল আমার। বাইরের অবস্থাটা খুব খারাপ। চাঁদ নেই। ঘুটঘুটে অন্ধকার। গাড়ি খারাপ হয়েছে একেবারে নির্জন জায়গায়।

ছাতা আর টর্চ হাতে আবার বেরিয়ে গেল বাবা। ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে নেচে নেচে এগিয়ে যেতে দেখলাম টর্চের আলোটাকে। কমতে কমতে হঠাৎ মিলিয়ে গেল। বাবাকে গিলে নিল যেন প্রবল বৃষ্টিপাত আর ঘন কালো অন্ধকার।

একা বসে রইলাম গাড়ির মধ্যে।

তবলায় টোকার বিরাম নেই। গড়িয়ে গড়িয়ে আসতেই আছে কুয়াশা। পেঁজা তুলোর মত ঘিরে ফেলছে সব কিছুকে। বিদ্যুৎ নেই, উইন্ডশীল্ড ওয়াইপার চলতে পারছে না। সামনের জানালার বাইরেটাকে লাগছে একটা ভেজা ব্ল্যাকবোর্ডের মত।

নিজের অজান্তে গায়ে কাঁটা দিল। গাড়ির মধ্যে থাকাটা নিরাপদ কিনা বুঝতে পারলাম না। এ সব নিয়ে যতই ভাবব, ভয় বাড়তে থাকবে। তাই বর্তমানের ভাবনা মন থেকে ঝেড়ে দূর করে দিয়ে অন্য চিন্তায় মন দিলাম। সারাটা দিন যা যা ঘটেছে, বিশেষ করে মলে, সেটা নিয়ে ভাবতে লাগলাম। বাবা হয়তো ঠিকই বলেছে, কল্পনাতেই আমি সময় পেরিয়ে গিয়েছিলাম। একটা ঘোরের মধ্যে চেঞ্জিং রুম থেকে বেরিয়ে দোকানের বাইরে চলে গিয়েছিলাম। ক্লডিয়া অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল বলে আমাকে দেখেনি।

কিন্তু কল্পনা কি এত বাস্তব হয়? নাকি মাথা খারাপ হয়ে

গিয়েছিল আমার? উল্টোপাল্টা, ভুলভাল সব দেখেছি! এমন একটা পর্যায়ে চলে গিয়েছিল মন, যেখানে কল্পনা আর বাস্তবের প্রভেদ বোঝা কঠিন ছিল।

পাগল হয়ে যাচ্ছি না তো?

অস্বস্তিভরে নড়েচড়ে বসতে গেলাম। সীট বেল্ট পরাই আছে। খুলতে যেতেই স্কার্টের পকেটে খসখস করে উঠল কিছু। একটা কাগজ। বিজ্ঞাপনের ছেলেটা দিয়েছিল।

এক সেকেন্ড! বিজ্ঞাপন!...এই তো প্রমাণ! এতক্ষণ মনে পড়েনি। আর কোন সন্দেহ নেই। কল্পনা নয়। সত্যি সত্যি সময় পেরিয়ে অতীতে চলে গিয়েছিলাম আমি।

পকেট থেকে কাগজটা বের করে পড়ার চেষ্টা করলাম। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যুৎ চমকাল। সবুজ রঙের কাগজ। আবার বিদ্যুৎ চমকানোর অপেক্ষায় রইলাম। যতবার চমকাল, একটু একটু করে পড়তে লাগলাম। দোকানটার গুণগান করেছে। ক্রিসমাসে কিছু জিনিস খুব সস্তায় পাওয়া যাবে, সেকথা লিখেছে। তবে আমার কথার সপক্ষে প্রমাণ করার মত তারিখ বা সন লেখা নেই।

পেছনটা উল্টে দেখলাম। আকাশ চিরে দিল বিদ্যুতের নীল শিখা। গুড়ুগুড়ু শব্দ কেঁপে কেঁপে চলে গেল এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে। আমাকে অবাক করে দিয়ে স্পষ্ট যেন একটা পরিচিত হস্তাক্ষরে লেখা দেখতে পেলাম:

না, তুমি পাগল নও।

তবে মস্ত বিপদের মধ্যে রয়েছ।

কেকটা বের করে হাতে নিয়ে নাও।

এখনই।

লেখা বলছে পাগল নই, কিন্তু আমার মনে হলো বদ্ধ পাগল হয়ে গেছি, একেবারে উন্মাদ। কেক বের করলে কি হবে?

আবার পড়তে গেলাম লেখাটা। নেই। সেই ফোন নম্বরটাই

শুধু। নাহ্, সত্যি সত্যি পাগল হয়ে গেছি! ভয় দুর্বল করে দিল আমাকে। কিন্তু কৌতূহল দমাতে পারলাম না। আরেকবার বিদ্যুৎ চমকাতে কাত হয়ে পেছনের সীট থেকে তুলে আনলাম কেকের বাক্সটা। কিন্তু তেমন ভারী লাগল না। বোমা থাকলে নিশ্চয় অনেক বেশি ভারী হত।

কি জানি, এমন কোন বোমাও রেখে থাকতে পারে, যেটা হাল্কা। খুব সাবধানে ডালা খুললাম। সিনেমায় দেখেছি, বাক্সে ভরা বোমার ডালা খুলতে গেলেই বুম করে ফাটে। ভেতরে তার-টার দেখলাম না। টিক টিক করে ঘড়িও চলছে না। কেকের গায়ে লেখা রয়েছে: হ্যাপি বার্থডে, রিটা।

এটাই কি বিপদ? এই কেক? হো হো করে হেসে উঠতে ইচ্ছে করল। মনকে ধমক দিলাম: নিজেকে সামলানোর চেষ্টা করো, রিটা! পাগলামি শুরু করেছ তুমি!

বিদ্যুৎ চমকাল আবার। কয়েকটা ছায়ামূর্তিকে আসতে দেখলাম। নিশ্চয় মেকানিক নিয়ে ফিরে এসেছে বাবা। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। কেকের কথাটা বাবাকে বললে হেসেই খুন হবে।

কাছে এসে দাঁড়াল সবচেয়ে আগের মূর্তিটা। দরজার লক খুলে দিয়ে, হাতল ঘুরিয়ে জানালার কাঁচ নামালাম। বাবা ভেবে জিজ্ঞেস করতে গেলাম, 'মেকানিক পেয়েছ?'

এই সময় চেহারাটা চোখে পড়ল।

বাবা নয়। কিন্তু চেনা চেনা লাগল। কোথায় দেখেছি? কোথায় দেখেছি? হ্যাঁ, মনে পড়ল। দেখেছি মলের দেয়ালে। পোস্টারের ছবিতে। যেখানে অপরাধীদের ছবি সাঁটানো হয়। এই গুণ্ডাটার চেহারার পাশেই হয়তো এতক্ষণে মলের দেয়ালে শোভা পাচ্ছে আমার মুখটাও। ভাবতে কালো হয়ে গেল মনটা।

আতঙ্কটা আসতে সময় লাগল। ধীরেই এল। তবে, এল। মুখ দিয়ে ছোট্ট একটা চিৎকার বেরিয়ে এল আপনাআপনি। দ্রুত

কাঁচটা নামিয়ে দিতে গেলাম। চট করে একটা হাত বাড়িয়ে দিল সে। ভেতরে ঠেলে দেয়ার আগেই তুলে দিতে পারলাম কাঁচটা। ভাগ্যিস গাড়িটাতে চাইল্ড লক আছে। দরজাটা খুলতে পারল না তাই। পটাপট যতখানে যতগুলো লক আছে, সব লাগিয়ে দিলাম।

তারপরের দৃশ্যটা হরর সিনেমার ভয়াল দৃশ্য বললে কম বলা হবে। চুপচুপে ভেজা ফ্যাকাসে চামড়া, চোখা নাক, মাথায় লেপটানো নানা রঙের চুলওয়ালা যুবকগুলোকে দেখে মনে হলো নরক থেকে উঠে এসেছে। মোট চারজন ওরা। গাড়ি ঘিরে ঘুরতে শুরু করল। থেকে থেকে চামড়ার দস্তানা পরা হাত দিয়ে চাপড় মারতে লাগল জানালার কাঁচে।

'হাই, বেবি,' দাঁত বের করে হাসল ওদের লাল-চুলো নেতাটা, যার ছবি মলে সাঁটানো আছে, 'বেরিয়ে এসো। কি বসে আছ গাড়ির মধ্যে!'

'হ্যাঁ, চলে এসো,' সুর মেলাল আরেকজন। 'এই গরমে বৃষ্টিতে ভিজতে বড় আরাম।' শরীরটা তার এত মোটা, ছোটখাট একটা জলহস্তী মনে হচ্ছে। কপালে উল্কি দিয়ে সাপ আঁকা।

'খেয়েদেয়ে আর কোন কাজ নেই তোমাদের?' চিৎকার করে জবাব দিলাম। 'বৃষ্টিতে ভেজার চেয়ে বরং গাঁজায় দম দাওগে। ইচ্ছে করলে ড্রাগও নিতে পারো। এখানে আমাকে জ্বালাতে এসেছ কেন?'

গাড়ির ট্রাংকে উঠে লাফাতে শুরু করল একজন। অন্য আরেকজন বুট পরা পায়ে লাথি মেরে একে একে ভেঙে ফেলতে লাগল হেডলাইট, টেল লাইট, পার্কিং লাইট।

'তুমি বললে ড্রাগ-ট্রাগ সবই নেব,' খিকখিক করে হেসে জবাব দিল নেতা। 'কিন্তু গাড়িতে বসে আছ কেন? বেরোও। বেরিয়ে এসে তারপর বলো। নাকি ভাবছ ওখান থেকে তোমাকে বের করে আনতে পারব না আমরা?'

'জাহান্নামে যা, শয়তানের দল!' চিৎকার করে উঠলাম আমি।

গাড়িটাকে দোলাতে শুরু করল ওরা। ভাগ্যিস ভলভো গাড়িগুলো খুব মজবুত করে বানায় কোম্পানি। দোলানোর চোটে গা গুলিয়ে উঠল আমার। ভয় পেয়েছি সেটা বুঝতে দিলাম না ওদের, চিৎকার করে বললাম, 'এ গাড়ির মধ্যে জীবনেও ঢুকতে পারবি না তোরা। এটা কি জানিস? ভলভো এস সেভেন্টি। গাড়ির জগতে সবচেয়ে শক্তগুলোর একটা।'

পাথর দিয়ে বাড়ি মারল জলহস্তীটা। ঝনঝন করে ভেঙে পড়ল ড্রাইভারের পাশের জানালা। ফোকর দিয়ে মাথা গলিয়ে বলল সে, 'সরি! তোমার ছোট্ট বাহনটার ক্ষতি করে ফেললাম না তো?'

কেকটা ব্যবহার করার সময় এসেছে। খানিক আগে কাগজে দেখা লেখাটার কথা মনে পড়ল। আশ্চর্য! কিভাবে সতর্ক করে দিল আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়!

বাক্স থেকে কেকটা বের করে যতটা জোরে সম্ভব বসিয়ে দিলাম ওর মুখে। কেক, মাখন, সব ছড়িয়ে গেল চতুর্দিকে। দলা দলা আটকে গেল ওর নাকে-মুখে, চুলে, মাথায়।

'সরি,' চিৎকার করে ওর কথাতেই জবাব দিলাম, 'তোমার ছোট্ট মুখটার কোন ক্ষতি করে ফেললাম না তো?'

মুখ খারাপ করে একটা গালি দিল সে। চোখ থেকে আঠাল চকলেট বের করার চেষ্টা করছে। 'আমি তোমার বারোটা বাজিয়ে ছাড়ব!'

'ধরতে পারলে তবে তো,' বলেই ওদিককার দরজার লকটা নামিয়ে, হ্যান্ডেলে মোচড় দিয়ে, জোড়া পায়ে লাথি মারলাম দরজার গায়ে। আঘাতটা সবচেয়ে বেশি লাগল জলহস্তীর মোটকা ভুঁড়িতে। হুঁক করে সমস্ত বাতাস বেরিয়ে গেল তার পেট থেকে। চিৎ হয়ে পড়ে গেল কাদার মধ্যে।

দলের বাকি তিনজন রয়েছে অন্যপাশে। লাফ দিয়ে গাড়ি থেকে নেমে ঝেড়ে দৌড় লাগালাম বনের দিকে।

বারো

এত বছরের চীয়ারলীডিং প্র্যাকটিস কাজে লাগল এখন। প্রায় উড়ে পার হয়ে এলাম খোয়া আর কাদাপানিতে ভরা রাস্তা। ঢুকে পড়লাম ঝড়ে উন্মত্ত বনের মধ্যে। যে ভাবে কোনদিকে না তাকিয়ে দৌড়াচ্ছিলাম, কপাল ভাল গাছের গায়ে কপাল ঠুকে গেল না। ডালপাতার বাড়ি লাগছে মুখে। দুই হাত সামনে বাড়িয়ে সরানোর চেষ্টা করতে করতে ছুটলাম। ভেজা কাপড় সেঁটে আছে গায়ের সঙ্গে। ডালপাতা, কাঁটালতা জড়িয়ে যাচ্ছে হাতে পায়ে, আঁকড়ে ধরছে। তবুও বনটা এখন গাড়ির চেয়ে নিরাপদ।

জীবনেও এত ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাতে দেখিনি আমি। সারা আকাশটাতে জালের মত বিছিয়ে যাচ্ছে তীব্র নীল শিখা। ক্ষণে ক্ষণে বজ্রের গর্জন। যেন কোন অজানা দানবেরা দল বেঁধে পৃথিবী আক্রমণ করতে আসছে। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকালাম। নীলচে-সাদা বিদ্যুতের আলোয় ঠিক আমার পেছনেই লেগে থাকতে দেখলাম গুণ্ডাগুলোকে।

প্রাণপণে দৌড়াতে থাকলাম। পেছন ফিরে তাকালাম না আর। যখন মনে হলো, আর পারব না, ধরা পড়ে যাবে, ঠিক তখন চোখে পড়ল সার্ভিস স্টেশনের আলো। পাহাড়ের মাথায়। বাবা সম্ভবত ওখানেই গেছে মেকানিকের খোঁজে। কুয়াশায় উজ্জ্বল হতে পারছে না আলোটা, ঘোলাটে গোল একটা আভা। যা-ই হোক, এ যাত্রা বোধহয় বেঁচে গেলাম।

কিন্তু পাহাড়ের ঢালটা চোখে পড়তে দমে গেলাম। ওটা বেয়ে

দৌড়ে ওঠা সহজ নয়। ধরে ফেলবে আমাকে গুণ্ডাগুলো। পেছনে চলে এসেছে।

তাই বলে থামলাম না। খোয়া বিছানো একটা রাস্তা উঠে গেছে চূড়ায়। সেটা ধরে উঠতে গিয়ে শরীর বাঁকা হয়ে গেল সামনের দিকে। পিছলে গেল স্যান্ডেল। পড়ে গেলাম উপুড় হয়ে। হাতের আঙুলগুলো নিজের অজান্তেই কাদায় বসে গিয়ে মাটি আঁকড়ে ধরল। হাঁপাতে হাঁপাতে বুক ব্যথা হয়ে গেছে।

ধরে রাখতে পারলাম না। আঙুলের সঙ্গে উঠে এল নরম মাটি। পিছলাতে শুরু করলাম। খানিকটা পিছলে নামার পরই গড়ানো শুরু করলাম। ধারাল পাথরের আঘাতে কেটে যেতে লাগল কপাল, কনুইয়ের চামড়া। পড়ে গেলাম কাদাপানিতে ভরা ছোট একটা গর্তের মধ্যে।

'তোলো ওকে!' চিৎকার করে বলল জলহস্তী। চোখেমুখে এখনও মাখন লেগে রয়েছে। এক হাতে পেট চেপে ধরে রেখেছে, যেখানে লেগেছিল গাড়ির দরজা। 'ওর বারোটা বাজাব আমি আজ!'

দুজন এসে দুদিক থেকে ধরে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল আমাকে।

'খুব চালাক ভাবো নিজেকে, তাই না?' বলল ওদের নেতাটা।

'না, তা আমি ভাবি না,' জবাব দিলাম। 'ভীষণ ঠাণ্ডা লাগছে আমার। খিদেয় পেট জ্বলছে। যে ভেজা ভিজেছি, সর্দি লেগে যাবে জানা কথা।' বেপরোয়া হয়ে উঠেছি। কাজেই কথা বলতে পরোয়া করলাম না। 'আর কি ভাবছি শুনবে? ভাবছি, সকালে কার মুখ দেখে আজ ঘুম ভেঙেছিল, তোমাদের মত একদল ঘেয়ো কুত্তার সামনে পড়তে গেলাম।'

আমার চারপাশ ঘিরে ঘুরতে শুরু করল নেতাটা। রাগে কথা বেরোচ্ছে না মুখ থেকে। ঢোক গিললাম। কিন্তু যা বলার বলে ফেলেছি, ফিরিয়ে নেয়া যাবে না আর।

'ঘেয়ো কুত্তা হই আর যা-ই হই,' কর্কশ কণ্ঠে বলল ওদের নেতা, 'তোমাকে একটা শিক্ষা না দিয়ে ছাড়ব না আজ, বিচ্ছু মেয়ে কোথাকার! রিকোর যা অবস্থা করেছ,' জলহস্তীকে দেখাল সে, 'তার জন্যে শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে।'

'অ, মোটকুর নাম তাহলে রিকো!' চুকচুক শব্দ করলাম জিভ দিয়ে। মুখ ফসকেই যেন বেরিয়ে গেল, 'আমি তো ভেবেছিলাম হিপো, হিপোপটেমাস।'

'চুপ...!' মুখ খিস্তি করে গালি দিল জলহস্তী। গর্জন করে বলল, 'আজ তোকে আমি...!'

কালো জ্যাকেটের নিচ থেকে টান দিয়ে বের করল কি যেন। বোতাম টিপতে ঝটাৎ করে খুলে গেল আট ইঞ্চি লম্বা ইস্পাতের ফলা। একটা সুইচব্লেড।

'আমাকে ইয়ার্কি মারা হচ্ছে, না! আমি হিপো?' ছুরির মাথাটা আমার পেটের দিকে তাক করে চিবিয়ে চিবিয়ে বলল রিকো, 'মজাটা আজ টের পাওয়াব!'

এক পা এগিয়ে এল সে।

দম বন্ধ করে পেটে ছুরি খাওয়ার অপেক্ষায় আছি। হাঁচি দিয়ে ফেললাম। হাঁচি দেয়ার মোটেও উপযুক্ত সময় নয় এটা। কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে, কাদায় গড়াগড়ি খেয়ে, পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে আমার অবস্থা তখন বড়ই শোচনীয়।

আচমকা ঝলকে উঠল লালচে-সাদা তীব্র আলো। আকাশের বিদ্যুতের মতই অসংখ্য বিদ্যুতের শিখা উঠে আসতে শুরু করল আমার পায়ের কাছ থেকে। আমাকে ঘিরে, আমার সমস্ত দেহ ঘিরে, ছড়িয়ে পড়ল কাদাপানিতে; সরু সরু আলোর সাপের মত ছুটে গেল আমার শত্রুদের দিকে।

সবগুলোকে জীবন্ত জালের মত জড়িয়ে ফেলতে লাগল সেই রঙিন বিদ্যুৎ-শিখা। গলা ফাটিয়ে চিৎকার শুরু করল ওরা। পাগলের মত নাচতে লাগল কাদার মধ্যে। হাত-পা ছুঁড়ে সেই

বিদ্যুৎ-বিভীষিকার কবল থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে।

দৃশ্যটা দ্রুত মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। তারপর সব অন্ধকার।

তেরো

জেগে উঠে চারপাশে বিচিত্র সব পোশাক পরা মানুষকে দেখতে পেলাম। হাসপাতালে রয়েছি। পায়ের কাছে দাঁড়ানো মহিলা ডাক্তার। ধূসর-চুল। বুকে লাগানো নেম-ট্যাগে নাম লেখা শেলী অলরিজ। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে আছে বাবা। সাংঘাতিক উদ্বিগ্ন। বাবার পাশে দাঁড়ানো একজন পুলিশ অফিসার।

পুলিশ কেন?

কাল থেকে সেই যে শুরু হয়েছে–আমার আতঙ্কের প্রহর কি আর শেষ হবে না!

'আমি ওই ব্লাউজ চুরি করিনি!' চিৎকার করে উঠলাম। 'জীবনে কারও জিনিস চুরি করিনি আমি!'

'কি-সের ব্লাউজ?' জানতে চাইল অফিসার।

'চরির অভিযোগে তোমাকে দায়ী করা হচ্ছেও না,' ঘরের আরেক পাশ থেকে বলে উঠল আরেকটা কণ্ঠ। সেদিকে তাকাইনি, তাই দেখিনি এতক্ষণ–এখন দেখলাম, পুলিশ চীফ ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার। হাসিমুখে এগিয়ে এলেন তিনি।

'চুপ করে থাকো, হনি,' আস্তে করে বাবা আমার কপালে হাত বুলিয়ে দিল। 'চুপচাপ শুয়ে থাকো। কোন চিন্তা কোরো না।'

'কিন্তু ও কিসের কথা বলল?' চুরির প্রসঙ্গ টেনে আনতে

চাইছে অন্য অফিসার।

'আহ্, থামো তো, ডেরিয়াল,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'মেয়েটা অসুস্থ। তাকে এ সময় বিরক্ত করার কোন দরকার আছে?...রিটা, আমাদের আসার কারণটা তোমাকে বলি। কিছুক্ষণ আগে তোমার ওপর হামলা চালানো হয়েছিল। মনে আছে?'

ধীরে ধীরে স্মৃতিটা ফিরে আসতে শুরু করল আমার। গাড়িতে আটকা পড়া...বনের মধ্যে ছোটার দুঃস্বপ্ন...আমাকে ঘিরে ছড়াতে থাকা বিদ্যুতের জাল...হাসপাতালে রয়েছি যখন, নিশ্চয় আমাকে ছুরি মেরেছে...

'হ্যাঁ, মনে আছে,' জবাব দিলাম। 'আমাকে ছুরি মারা হয়েছে!'

'না না, হনি,' বাবা বলল, 'তোমার কিচ্ছু হয়নি। ছুরি ওরা মারতে পারেনি তোমাকে।'

ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে শরীর। বালিশে মাথা রাখলাম। চোখের পাতা মেলতেও কষ্ট হচ্ছে।

'তোমাকে এখন প্রশ্ন করতে খারাপই লাগছে,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'কিন্তু তোমার স্মৃতিটা তাজা থাকতে থাকতে সব কথা জেনে নিতে চাই। বদমাশগুলোকে শায়েস্তা করতে হলে সব জানতে হবে আমাদের।'

'ওই চার গুণ্ডার কথা বলছেন?'

'হ্যাঁ। ওরা এখন পুলিশের কব্জায়। শয়তানের গোড়া একেকটা। ওদের বিরুদ্ধে আগেও পুলিশের খাতায় অভিযোগ ছিল। এখন তো হাতেনাতেই ধরা পড়ল। দেখলে চিনতে পারবে?'

'পারব মানে?' হেসে উঠলাম। 'ওদের চেহারা এখনই মুখস্থ বলে দিতে পারি আপনাকে।...এমনকি ছবি কোথায় পাবেন, তা-ও বলতে পারব।'

'ছবি!'

মুখ ফসকে কথাটা বলে ফেলে আফসোস করতে লাগলাম। কিন্তু আর ফেরার উপায় নেই। 'মলের দেয়ালে অভিযুক্তদের ছবি

যেখানে সাঁটানো হয়, সেখানে দেখতে পাবেন ওদের নেতার ছবি–বাকি চারটেও নিশ্চয় আছে, অত খেয়াল করিনি; আমার ছবিটার পাশে।'

'তোমার ছবি মানে?' কথাটা ধরে বসল অফিসার ডেরিয়াল। 'তুমি চুরি করেছিলে নাকি?'

'না, করিনি!'

'সে অনেক কথা,' প্রসঙ্গটা চাপা দেয়ার চেষ্টা করল বাবা।

বিরক্ত দৃষ্টিতে ডেরিয়ালের দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন। আমার দিকে ফিরে বললেন, 'আসল কথা আগে। রিটা, গুণ্ডাগুলো কিভাবে তাড়া করল তোমাকে, খুলে বলতে পারবে?'

'হ্যাঁ, পারব। গাড়িতে বসে ছিলাম,' বললাম আমি। 'বাবা গিয়েছিল সার্ভিস স্টেশনে, গাড়ি ঠিক করার জন্যে মেকানিক আনতে। চারপাশ থেকে ভূতের মত এসে উদয় হলো শয়তানগুলো। গাড়িটাকে ঘিরে ফেলে জানালায় থাবা মারতে লাগল কেউ, কেউ ট্রাংকে উঠে লাফানো শুরু করল; তারপর একজন পাথর দিয়ে বাড়ি মেরে জানালার কাঁচ ভাঙল।'

'কোন্‌টা?'

'মোটকা জলহস্তীটা। ওর নাম নাকি রিকো।'

'খোঁচা দিয়ে কথা বলেছিলে?'

'নামটা ঠিক হয়নি বলে হেসেছিলাম।'

'তারমানে নাম নিয়ে ব্যঙ্গ!' আনমনে বিড়বিড় করে ছোট একটা কালো পুলিশ বুকে তথ্যটা লিখে নিল ডেরিয়াল।

'ডেরিয়াল, তুমি এখান থেকে যাও তো,' শীতল কণ্ঠে বললেন ক্যাপ্টেন। 'হলে গিয়ে অপেক্ষা করো।...রিটা, জানালার কাঁচ ভাঙার পর কি করলে?'

'কোনমতে গাড়ি থেকে বেরিয়ে দৌড়ে ঢুকে পড়লাম বনের মধ্যে। সার্ভিস স্টেশনটা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলাম। ঢাল বেয়ে উঠতে গিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেলাম নিচে। একেবারে ওদের

হাতের মুঠোয়।'

'তারপর? বাধা দিলে কিভাবে?'

'আমি আসলে বাধা দিতে পারিনি,' ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা কল্পনা করে নিজের অজান্তেই ভুরু কুঁচকে গেল আমার। 'ছুরি বের করে আমাকে মারতে আসছিল হিপো...মানে, রিকো, হঠাৎ বাজ পড়ল ওদের ওপর...'

'বাজ পড়লে তুমি রেহাই পেলে কি করে?' সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করল ডেরিয়াল।

'তোমাকে না এখান থেকে যেতে বললাম!' ধমকে উঠলেন ক্যাপ্টেন।

দরজার দিকে এগোল ডেরিয়াল। ভঙ্গি দেখেই বোঝা গেল, যেতে ইচ্ছে করছে না।

আমার দিকে তাকালেন ক্যাপ্টেন, 'হ্যাঁ, বাজ পড়ল, তারপর?'

আমি জবাব দেবার আগেই ডাক্তার বলে উঠলেন, 'কিন্তু তা কি করে সম্ভব? রিটা, তুমি যা-ই বলো, ওই ছেলেগুলো বজ্রপাতের শিকার নয়।'

'কিন্তু ডাক্তার,' ক্যাপ্টেন বললেন, 'প্রচণ্ড ইলেকট্রিক শক্ খেয়েছে ওরা, এটা তো ভুল নয়?'

'না, ভুল নয়। তবে বজ্রপাত থেকে শক্ খায়নি ওরা। বজ্রপাত হলে জুতো, কাপড়-চোপড় পুড়ে যেত, চামড়া ঝলসে যেত। কিন্তু তেমন কোন জখমই নেই ওদের শরীরে। কাপড়ের কোন ক্ষতি হয়নি। এত কাছে থেকে রিটাও অক্ষত থাকত না।'

'কিন্তু আমি নিজের চোখে দেখলাম,' জোর দিয়ে বললাম আমি। 'হঠাৎ জ্বলে উঠল লাল-সাদা বিদ্যুতের শিখা, ঘিরে ফেলল ওদের।'

'অন্য কোন ধরনের বজ্র নয় তো?' বাবা বলল। 'বল্ লাইটনিং বা অন্য কিছু?'

'বল্ লাইটনিং জাতীয় কিছু বাস্তবে সত্যি আছে কিনা জানা

নেই আমার, ডাক্তার বললেন। 'যদি থাকেও, ওই বিদ্যুতের শিকার নয় ছেলেগুলো। ওদেরকে যেটা আঘাত হেনেছে সেটা লো-অ্যাম্পিয়ারেজ কিন্তু হাই-ভোল্টেজ এনার্জি সোর্স থেকে আসা। কোন ধরনের স্টান গান হতে পারে।'

'স্টান গান! মানে অবশ করে দেয়া বন্দুক?' বাবা বলল। 'তারমানে আর কেউ ছিল তখন ওই বনে, গাছের আড়ালে লুকানো...'

'আমার তা মনে হয় না,' ক্যাপ্টেন বললেন। 'ওই নির্জন গভীর জঙ্গলে, অন্ধকারে, প্রবল ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে অকারণে কে বসে থাকবে ট্যাজার গান নিয়ে?' তারপর যেন নিজেকেই বোঝালেন, 'অবশ্য এ ছাড়া আর ব্যাখ্যাটাই বা কি!'

আমিও ক্যাপ্টেনের সঙ্গে একমত। আমি আর ওই গুণ্ডাগুলো ছাড়া জঙ্গলে কেউ ছিল না তখন। ভেবে অবাক হলাম। বজ্রপাত না হলে বিদ্যুৎ এল কোথা থেকে? আমার কিছু হলো না কেন? তবে কি...নিজের কাছেই প্রশ্নটা বেখাপ্পা লাগল আমার: আমিই কি কোনভাবে উৎপন্ন করেছি ওই বিদ্যুৎ?

'স্টান গানটা তোমার কাছে ছিল না তো, রিটা?' দরজার কাছ থেকে জিজ্ঞেস করল ডেরিয়াল। হলে যায়নি সে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল।

হাসলাম। ডান হাতের তর্জনী তুলে পিস্তলের মত তাক করলাম তার দিকে। 'এই যে আমার স্টান গান।'

রীতিমত চমকে গেল ডেরিয়াল। লাফ দিয়ে সরে গেল দরজার কাছ থেকে।

আমার রসিকতায় হেসে উঠল ঘরের সবাই।

'যাকগে, ওসব কথা,' যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যাখ্যা না পাওয়ায় সন্তুষ্ট হতে পারলেন না ক্যাপ্টেন। 'রিটা, বদমাশগুলোকে চিকিৎসার জন্যে স্টেট হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। চিকিৎসা শেষে থানায় নেয়া হবে। যাবে দেখতে?'

রাতের ঘটনার কথা ভাবলাম। আরেকবার ওদেরকে দেখার কৌতূহল সংবরণ করতে পারলাম না। বললাম, 'যাব।'

*

হাসপাতালের লোডিং বে-তে পৌঁছে শব্দ শুনেই বোঝা গেল কোথায় আছে ওরা।

'আমি যাব না! আমি যাব না!' শুনতে পেলাম চিৎকার। পরিচিত সেই কর্কশ কণ্ঠ। নেতাটা। 'হাত সরাও!'

'তোমাকে কে কেয়ার করে, দারোয়ানের ছাও?' চিৎকার করে উঠল আরেকজন। 'পিস্তল রেখে এসো দেখি, হয়ে যাক এক হাত, কে হারে কে জেতে!' হিপোর কণ্ঠ।

এক সারি অ্যামবুলেন্সের কাছে এসে থামল আমাদের গাড়ি। বাবা, ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার, অফিসার ডেরিয়াল এবং আমি—গাড়ি থেকে নামলাম। দেখতে পেলাম সেই চার যুবককে। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তি করছে। ওদের ভ্যানে তোলার চেষ্টা করছে দুজন পুলিশ। কোনমতেই ভ্যানে উঠতে চাইছে না। হাসপাতালের সিকিউরিটি গার্ডেরা ঘিরে রেখেছে চারপাশ থেকে।

চারজনের হাতেই হাতকড়া। একজনের হাতের সঙ্গে আরেকজনকে জোড়া দিয়ে শেকল বানিয়ে ফেলা হয়েছে। আলাদা থাকলে দৌড় দিত। একটা বিচিত্র জিনিস লক্ষ করলাম—ওদের চুল: তারের মত খাড়া হয়ে আছে। বৈদ্যুতিক শক খেয়েছে যে, নিশ্চয় সেজন্যে।

'বাহ্, চুলের ছাঁট তো বেশ চমৎকার হয়েছে!' বলতে বলতে হাসিমুখে এগিয়ে গেলাম ওদের দিকে। 'কে ছেঁটে দিল? ডিজাইনার হবিস হপকিনস?'

আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল আমার দিকে নেতা-গুণ্ডা। আতঙ্ক ফুটল চোখের তারায়। ঝুলে পড়ল নিচের চোয়াল। চিৎকারের ভঙ্গিতে হাঁ হয়ে গেল মুখ। শব্দ বেরোল না।

কিন্তু হিপোর চিৎকার রুদ্ধ হলো না। আমাকে দেখার সঙ্গে

সঙ্গে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ বেরিয়ে এল মুখ থেকে। সোজা দৌড় দিল পুলিশ ভ্যানের দিকে। বাকি তিনজনকেও টানতে টানতে নিয়ে চলল সঙ্গে। যেটাতে উঠতে বাধা দিচ্ছিল এতক্ষণ, সেই ভ্যানটাই যেন ওদের শেষ আশ্রয়স্থল।

'সরাও, সরাও ওকে!' মুখে কথা ফুটল লাল-চুলো নেতাটার। 'ও একটা আস্ত ডাইনী!' দুজন পুলিশ অফিসারের আড়ালে লুকিয়ে পড়তে চাইল সে। 'এবার আমাদের মেরেই ফেলবে! দোহাই তোমাদের, আমাকে জেলখানাতেই নিয়ে চলো!'

'প্লীজ!' কেঁদে ফেলল বাহাদুর হিপো। 'ওকে কাছে আসতে দিয়ো না!'

স্তব্ধ বিস্ময়ে দৃশ্যটা তাকিয়ে দেখলেন ক্যাপ্টেন ইয়ান ফ্লেচার, অফিসার ডেরিয়াল ও বাবা। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না কেউ। একজন একজন করে চোখ ফেরাল আমার দিকে।

'হ্যাঁ, এরাই,' ক্যাপ্টেনকে বললাম আমি। 'এই শয়তানগুলোই কাল রাতে ধাওয়া করেছিল আমাকে।'

চোদ্দ

ঘড়ির অ্যালার্মের শব্দে চোখ মেলতে বাধ্য হলাম। মনে হলো কয়েক মিনিট আগে ঘুমিয়েছি। রাগ হলো ঘড়িটার ওপর। তাকিয়ে দেখি, দুপুর পেরিয়ে গেছে। তারমানে দীর্ঘ সময় ঘুমিয়েছি।

জানালার বাইরে উজ্জ্বল আলো। মনে পড়ল সব কথা। কাল

রাতে ডাক্তার অলরিজকে দিয়ে আমার রিলিজ পেপার সই করিয়ে বাড়ি নিয়ে এসেছে বাবা। ঘড়িটাতে আমিও অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম। গরমের ছুটি। স্কুলে যাবার তাড়া নেই। ভাবলাম, আরেকটু ঘুমিয়ে নিই।

অ্যালার্ম বন্ধ করার জন্যে সুইচ টিপতে গেলাম। কিন্তু ঘড়িটার গায়ে আমার আঙুলের ছোঁয়া লাগতেই অদ্ভুত একটা কাণ্ড ঘটল। বন্ধ হয়ে গেল ঘড়িটা। পুরোপুরি মৃত! অ্যালার্ম তো বন্ধ হলোই, সময় শো করার যে লাল নম্বরগুলো জ্বলছিল, সেগুলোও নিভে গেল মুহূর্তে।

চোখ থেকে ঘুম দূর হয়ে গেল আমার। মনে পড়ল গাড়িটার কথা। গতরাতে গাড়িটাও এই ঘড়ির মতই আচমকা মরে গিয়েছিল।

তুলে নিলাম ঘড়িটা। অদ্ভুত একটা সুড়সুড়ি জাতীয় অনুভূতি টের পেলাম আঙুলে। হাত, বাহু বেয়ে উঠে এল শরীরে, পেটের কাছে নেমে গেল। চাঙা বোধ করতে লাগলাম।

লাফ দিয়ে বিছানা থেকে মাটিতে নামলাম। ড্রেসারের ওপর চোখ পড়তেই দেখতে পেলাম সিডি প্লেয়ারটা। পাশে রাখা সেই ব্লাউজ, যেটার কারণে এত হেনস্তা হতে হয়েছিল গতকাল।

সিডিটা নতুন। নিশ্চয় আমার জন্মদিনের উপহার। বাবা কিনে এনে রেখে দিয়েছে, আমি যখন ঘুমিয়েছিলাম।

খুব খুশি হলাম। বাবার প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে গেল মনটা। এত ভাল বাবা খুব কম মেয়েরই ভাগ্যে জোটে।

এ রকম একটা সিডি প্লেয়ার পাওয়ার আমার বহুকালের শখ। বাজাতে গেলাম। ড্রেসারের নিচে কার্পেটের ওপর ফেলে রাখা হয়েছে বাক্সটা। ওতে একটা পাতলা বই পেলাম। কি করে বাজাতে হয়, লেখা রয়েছে তাতে।

সিডি প্লেয়ার বাজাতে জানি আমি। তা-ও বইটা দেখে নিলাম ভালমত। সিডির পেছনের তার-সহ প্লাগটা বের করে নিলাম।

সকেটে ঢোকাতে হবে। সকেটটা রয়েছে আমার পড়ার টেবিলের নিচে। চেয়ার সরিয়ে ঢুকে পড়লাম টেবিলের নিচে। প্লাগের কাঁটাগুলো ঢোকাতে গেলাম সকেটে। ঢুকল না।

কয়েকবার চেষ্টা করে কেন ঢুকছে না দেখার জন্যে তুলে আনলাম চোখের সামনে। একটা কাঁটা সামান্য বাঁকা হয়ে আছে। মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। নতুন জিনিসটার বাঁকা কাঁটা! সোজা করতে প্লায়ার্স লাগবে। বেরিয়ে আসার আগে প্লায়ার্স ছাড়াই সোজা করা যায় কিনা দেখার জন্যে দুই আঙুলে টিপে ধরে চাপ দিলাম। বাকি আঙুলগুলোর কোন একটা বোধহয় অন্য কাঁটাটাতে লেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘটে গেল এক আজব ঘটনা। জ্যান্ত হয়ে উঠল সিডি প্লেয়ার। পাওয়ার পেয়ে গেছে। বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু হয়ে গেছে মেশিনে। একটা সিডি ঢোকানোই ছিল, প্লে বাটনটাও অন করা ছিল, বাজতে শুরু করল সেটা।

এমন ভাবে চমকে গেলাম, টেবিলের নিচে আছি ভুলে গিয়ে মাথা তুলতে গিয়ে বাড়ি খেলাম টেবিলে। ব্যথা লাগল। উহ্ করে মাথা নিচু করে ফেললাম।

প্লাগটা ছেড়ে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম বাইরে। আমি ছেড়ে দিতেই আবার পাওয়ার চলে গেছে, অফ হয়ে গেছে প্লেয়ার। বুঝতে আর অসুবিধে হলো না, আমি একটা চলমান জেনারেটরে পরিণত হয়েছি।

চোখ পড়ল আবার ব্লাউজটার ওপর। মনে হলো, গতকাল ওটা গায়ে দেয়ার পর থেকেই যত গণ্ডগোল শুরু হয়েছে। গায়ে দিয়ে অতীতে চলে গিয়েছিলাম। নিজের মধ্যের ভয়ঙ্কর ক্ষমতাটা প্রকাশ পেল...

সত্যি কি তাই?

আরেকবার পরীক্ষা করে দেখার কৌতূহল দমন করতে পারলাম না। নিশ্চিত হতে হবে, ওই ব্লাউজটার মধ্যেই লুকানো রয়েছে কিনা এত ক্ষমতা। জানাটা জরুরী মনে হলো আমার

কাছে।

ব্লাউজটা হাতে করে নিয়ে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়ালাম। আয়নার দিকে চোখ রেখে ধীরে ধীরে পরে ফেললাম। ভয় লাগছে। বুকের মধ্যে দুরুদুরু করছে। কি ঘটবে জানি না।

মলের ড্রেসিং রূমে যা ঘটেছিল, ঠিক একই ভাবে মিটমিট করতে লাগল ঘরের বাতিটা। কানের কাছে গুঞ্জন শুনলাম। তারপর দপ করে বাতি নিভে গেল।

জ্বলে উঠল আবার।

ঘরের বাইরে পদশব্দ শুনতে পেলাম। বাবা আসছে নিশ্চয়। 'বাবা!' গলা চড়িয়ে ডাক দিয়ে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। উপহারটার জন্যে একটা ধন্যবাদ দেয়া দরকার। 'বাবা...'

দরজা খুলেই স্থির হয়ে গেলাম।

বাবা নয়!

*

পড়া থামাল রবিন। দম নিল। ডায়েরীতে ক'টা পাতা আর বাকি আছে উল্টে দেখল। মুখ তুলে বলল, 'আর বেশি নেই। মাত্র কয়েকটা পাতা।'

'পড়ে ফেলো,' মুসা বলল। 'বাপরে বাপ, এ কি গল্প শোনাচ্ছে! আমার কাছে তো রীতিমত ফ্যান্টাসি মনে হচ্ছে!'

মাথা ঝাঁকাল জিনা। 'চোখের সামনে সেদিন কিশোরকে রূপ পাল্টাতে না দেখলে বিশ্বাসই করতাম না। ভাবতাম, রিটা গুল মারছে।'

'পড়ো, পড়ো!' তাগাদা দিল মুসা।

লম্বা শ্বাস টেনে ফুসফুস বোঝাই করল রবিন। ধীরে ধীরে সেটা বের করে দিয়ে চোখ নামাল আবার ডায়েরীর পাতায়। রিটা লিখেছে:

এমন একজনকে দেখতে পেলাম, যাকে বহুকাল দেখি না। পরনে বড় বড় গোলাপী ফুল আঁকা কাপড়ের হাউসড্রেস। কানে

ম্যাচ করা রঙের রিং। ওই পোশাক আমার অতি পরিচিত। কতবার ওটার নিচের অংশ ধরে টানাটানি করেছি। ওটা ধরে শপিং সেন্টারে গেছি, আরও কত কি।

'মা!' চিৎকার দিয়ে সামনে ছুটে গেলাম।

ঠোঁটে আঙুল রেখে চিৎকার করতে মানা করল মা। আমার ঘরে ঢুকে আস্তে লাগিয়ে দিল দরজাটা।

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আবার সেই মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে আছি, বহু বছর আগেই যাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। জীবনে আর কোনদিন দেখতে পাব স্বপ্নেও ভাবিনি। হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারছি। স্বপ্ন নয়, পুরোপুরি বাস্তব।

হঠাৎ লক্ষ করলাম আমার ঘরটাও বদলে গেছে। গত গ্রীষ্মে কেনা বাঘের গায়ের ডোরাকাটা রঙের বেডশীটটা নেই বিছানায়, তার জায়গায় পাতা রয়েছে জলকুমারী আঁকা চাদর। জানালার পর্দাগুলো রঙধনু রঙের। বহু বছর আগে বাবা কিনে এনে দিয়েছিল মাকে। আমার প্রিয় গায়ক-গায়িকার পোস্টারগুলো দেয়াল থেকে উধাও। ওগুলোর জায়গায় টানানো রয়েছে কয়েকটা হাতে আঁকা ছবি। একটা বিশেষ ছবির দিকে চোখ পড়তে যেন প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেলাম। নতুন টানানো হয়েছে। একটা শপিং সেন্টার থেকে কিনে আনা হয়েছিল, ১৯৮৭ সালে। তেরো বছর আগে আমার বেডরুমটা যে ভাবে সাজানো ছিল, সেই দৃশ্য।

আমার মাকেও সে-সময় যেমন দেখেছিলাম, তেমনি আছে। তেমনি সুন্দরী। তেমনি হাসিখুশি।

ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম। বহুদিন পর আবার যখন ফিরে পেয়েছি, কোনমতেই আর ছাড়ব না।

'আরে, ছাড়, ছাড়!' সেই আগের মত হেসে বলল মা। আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। 'রিটুমণি, কেমন আছিস, মা?'

মায়ের মুখের সেই পুরানো আদুরে ডাক শুনে সহ্য করতে পারলাম না। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম। মায়ের জন্যে কি যে শূন্যতা

জমে ছিল আমার বুকের মধ্যে! হাজারটা প্রশ্ন ছলবলিয়ে উঠে আসছে যেন আমার মুখে। কোন্‌টা বাদ দিয়ে কোন্‌টা করব? জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার কি হয়েছে, মা? আমি এখানে এলাম কি করে?'

'আমিই প্রোগ্রাম সেট করে রেখেছি, যাতে তুই চলে আসতে পারিস এখানে,' মা জবাব দিল।

'প্রোগ্রাম মানে?' তাজ্জব হয়ে গেলাম। 'আমি কি ভিসিআর নাকি?'

হেসে উঠল মা। 'অনেকটা তা-ই। ভিসিআর-এর সার্কিটে ছোট্ট কম্পিউটার চিপ থাকে, মনে করিয়ে দেয় কখন যন্ত্রটাকে অন করে রেকর্ড শুরু করতে হবে, জানিস তো?'

মাথা ঝাঁকালাম।

'মানুষের দেহটাকেও ভিসিআর-এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। তফাৎটা শুধু তারের মাধ্যমে সঙ্কেত পাঠায় কম্পিউটার চিপ, আর মানুষের পাঠায় মগজ–খুব সূক্ষ্ম বৈদ্যুতিক সঙ্কেত, স্নায়ুর মাধ্যমে।'

'তারমানে আমি যা করতে পারছি,' জিজ্ঞেস করলাম, 'সব মানুষই তাই পারবে?'

'না,' মাথা নাড়ল মা, 'তা পারবে না। আর সব মানুষের মধ্যে বৈদ্যুতিক সঙ্কেত এত দুর্বল, আছে যে সেটাই বুঝতে পারে না। তোর ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। তুই যে কোন মেশিনের ব্যাটারি থেকে শক্তি সংগ্রহ করে নিজের ভেতরে সঞ্চয় করতে পারিস। একটা জিনিস লক্ষ করেছিস, তোর এবারের জন্মদিনের শুরু থেকে তোর ছোঁয়ায় বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতিগুলো কেমন উদ্ভট আচরণ করে?'

'হ্যাঁ,' উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। 'আমাদের গাড়িটা আচমকা মাঝরাস্তায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঘড়িটা গেল ডেড হয়ে। সিডি প্লেয়ার চলল। বাতিগুলোর কাছাকাছি গেলেই মিটমিট শুরু

করে।'

'হুঁ, তারমানে আঁচ করে ফেলেছিস নিজের ভেতরের ক্ষমতার কথা,' মা বলল। 'ওসব যন্ত্র থেকে সমস্ত বিদ্যুৎ শুষে নিয়ে নিজের ভেতরে জমা করে ফেলেছিলি নিজের অজান্তে। সে-জন্যেই ডেড হয়ে গিয়েছিল যন্ত্রগুলো।'

'বলো কি! আমি তাহলে বান মাছের মত মানুষকে বৈদ্যুতিক শক্ দিতে পারি?'

হাসিতে ঝিলিক দিয়ে উঠল মায়ের চোখ। 'বান মাছের চেয়ে অনেক বেশি পারিস। তবে কাউকে যাতে অহেতুক শক্ না দিয়ে বসিস, সে-জন্যে এটার ব্যবহার শিখতে হবে তোকে। নিয়ন্ত্রণ করা জানতে হবে। তা না হলে কখন যে কাকে খুন করে ফেলবি, ঠিক নেই।'

আমার হাত নিজের হাতে তুলে নিল মা। 'তবে ভয় নেই, নিয়ন্ত্রণ করা শিখতে সময় লাগবে না। এটা তোর একটা বাড়তি ক্ষমতা। আসল ক্ষমতাটা জাম্পিং। তুই একজন জাম্পার।'

'আমি কি?'

'জাম্পার। আমাদের বাস্তবতাকে নিয়ন্ত্রণ করে যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফোর্স, নিজের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চয় করে তার মধ্যে সুড়ঙ্গ তৈরি করে ফেলতে পারিস তুই। সেই সুড়ঙ্গে ঝাঁপ দিয়ে মুহূর্তের মধ্যে চলে যেতে পারিস যে কোন সময়ে–যাকে মোটামুটি ভাবে বলা হয়ে থাকে টাইম ট্র্যাভেল বা সময়-ভ্রমণ।'

'ওভাবেই আমাকে এই উনিশশো সাতাশি সালে নিয়ে এসেছ নাকি?' মায়ের কথা হাঁ করিয়ে দিয়েছে আমাকে।

মুচকি হাসল মা। 'আমি আনিনি। আমি জাম্পার নই। তুইই এসেছিস আমার কাছে। নিজেই নিজেকে নিয়ে এসেছিস।'

'কিন্তু কিভাবে? আমি তো চেষ্টাও করিনি।'

'চেষ্টা তোকে করতে হয়ও না। তোর অতি-ইন্দ্রিয়ই এ

ব্যাপারে তোকে সাহায্য করে।'

'বুঝলাম না।'

'আচ্ছা, বল্ তো, কখন উড়তে শেখে পাখির ছানা? ওড়ার জন্যে তাকে কি কোন শিক্ষা নিতে হয়?'

'না,' জবাব দিলাম।

'তারমানে উড়তে পারার ক্ষমতাটা ওর জন্মগত। ডিমের ভেতর থেকে যেদিন বেরোয় সেদিন থেকে ক্ষমতাটা তৈরি হয়ে যায় ওর মধ্যে। কিন্তু পারে না যতক্ষণ না মা ওকে বাসা থেকে ঠেলে ফেলে দেয়।'

মা'র কথা ভয় ধরিয়ে দিতে লাগল আমার। 'তুমি কি বলতে চাইছ আমি উড়তেও পারি?'

'না, তা পারিস না। একটা উদাহরণ দিলাম। বাসা থেকে ঠেলে ফেলার পর হঠাৎ করেই আবিষ্কার করে ফেলে পাখির ছানা, সে উড়তে পারে। কিছুক্ষণ আনাড়ির মত ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে শেষে ঠিক শিখে ফেলে কি করে ওগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। সময়মত আমিও তোকে কেবল একটা ঠেলা দিয়ে দিয়েছি। বাকিটা তোর আপনা-আপনিই হয়ে যাবে।'

'কিন্তু,' মহা অস্বস্তিতে পড়ে গেলাম, 'তুমি আমাকে ঠেলা দিলে কিভাবে? তুমি তো আমার সঙ্গেই ছিলে না।'

'ছিলাম,' মাথা ঝাঁকাল মা। 'তুই সেটা বুঝতে পারিসনি। বহুকাল আগে তোর মগজে একটা মেসেজ রেখে দিয়েছিলাম আমি। তোর এবারকার জন্মদিনে যাতে আমার কাছে আসতে পারিস, পিছিয়ে আসতে পারিস এখনকার সময়ে। মেসেজটাকে উস্কে দেয়ার জন্যে আরও একটা জিনিসের ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম, যেটা দেখলেই মনের মধ্যে ঝড় ওঠে তোর...'

'ব্লাউজটা!' জোরে কথা বলতেও ভয় পাচ্ছি, যেন চিৎকার করলেই এই মধুর স্বপ্নটা টুটে যাবে, অদৃশ্য হয়ে যাবে মা।

বুঝতে পারছি এখন, দোকানে ব্লাউজটা দেখে চেনা চেনা

লেগেছিল কেন।

'হ্যাঁ,' মা বলল, 'ওটা এক ধরনের ভিজিউল ট্রিগার। অভ্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর কোন কিছুর সাহায্য ছাড়া নিজে নিজেই জাম্প করতে পারবি। কিন্তু আপতত ট্রিগারটা অন করার জন্যে সামনে একটা কিছু থাকা দরকার। ব্লাউজটা দিয়েই প্রোগ্রাম সেট করে রাখতে হয়েছিল আমাকে।' ঘড়ি দেখল মা। 'আর বেশি সময় নেই আমাদের হাতে।'

এই কথাটা শোনার ভয়ই করছিলাম। আবার হারাতে যাচ্ছি মাকে। 'কেন? যাবে কেন?'

মা যেন আমার কথা শুনতেই পেল না। 'একটা কথা মনে রাখবি, সময়-ভ্রমণ একটা ভয়ানক ব্যাপার। এতে স্পেস-টাইম কনটিনামে চিড় ধরায়। অতীতের সামান্যতম পরিবর্তনও ভয়ঙ্কর সময়-কম্পন সৃষ্টি করতে পারে...'

চোখ বন্ধ করল মা। মাথা ঝেড়ে অতীতের কোন স্মৃতি যেন ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইল। 'ব্যাপারটা বড়ই জটিল, রিটু। এখানে যত কম সময় কাটাবি তুই, ততই ভাল। সে-জন্যে মাত্র পনেরো মিনিটের জন্যে তোকে এখানে নিয়ে এসেছি আমি।'

'পনেরো মিনিট! মাত্র! কিন্তু আমার তো আরও অনেকক্ষণ থাকার ইচ্ছে।'

আমার হাতে মা'র হাতের চাপ শক্ত হলো। 'চাইলেই তো আর সব হয় না। কথা বাড়াসনে। জরুরী কথা সারতে হবে। তোকে এখানে ডেকে আনার সেটাও একটা কারণ।' একটা খাম থেকে একটা ফটোগ্রাফ বের করল মা। ছয় থেকে সাত বছর বয়সের পাঁচটা হাসিখুশি ছেলেমেয়ের গ্রুপ ছবি। 'নে, এগুলো দেখ। দেখে বল তো, কাউকে চিনতে পারিস কিনা।'

ছবিগুলো পরিচিত লাগল আমার। বিশেষ করে একটা মেয়ের চোখ। মাথা নেড়ে বললাম, 'চেনা চেনাই লাগছে, তবে চিনতে পারছি না।'

'এদের সবার বয়েস এখন তোর সমান হয়ে গেছে,' মা বলল। 'নাম বললে হয়তো চিনবি না। কারণ পরিচয় গোপন রাখার জন্যে আসল নামও হয়তো বদলে ফেলা হয়েছে।'

ছবিটা হাতে নিয়ে আরও ভাল করে চেহারাগুলো দেখতে লাগলাম। চিনে ফেললাম একজনকে। একটা মেয়ে, যার চোখ বেশি পরিচিত লাগছিল। মেয়েটার ছবিতে আঙুল রেখে বললাম, 'ডানা হিউগ্রি! কিন্তু ও তো কিছুদিন আগে রহস্যময় ভাবে উধাও হয়ে গেছে। ভিনগ্রহবাসীরা ধরে নিয়ে গেছে তাকে!'

'সর্বনাশ!' খবরটা শুনে প্রচণ্ড এক ধাক্কা খেল মা। আমার চোখের দিকে তাকাতে পারল না।

'কি মা, কি হয়েছে?' জানতে চাইলাম।

'তারমানে ওরা জেনে গেছে,' মা বলল। 'এবং তারমানে তোকেও ধ্বংস করতে কিংবা ধরে নিয়ে যেতে আসবে ওরা। সাবধান, রিটা,' মা কতটা সিরিয়াস, আমাকে 'রিটা' বলে ডাকাটাই তার প্রমাণ, 'খুব সাবধান! তোকে বাঁচানোর জন্যে আমি ওখানে থাকতে পারব না। নিজেকে বাঁচাতে হবে তোর নিজেরই।'

'কি বলছ, মা? কার হাত থেকে বাঁচাব?'

'সময় নেই, যা বললাম মনে রাখিস। আরেকটা কথা, কোন কথা জানতে হলে মাদাম জিৎসুর সঙ্গে যোগাযোগ করিস। ওই মহিলা অনেক জ্ঞানী, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের অনেক খবর রাখে...'

'তুমি ওই জিপসি গণক মহিলার কথা বলছ? ও তো একটা চীট...'

'গুড-বাই, রিটু!'

'মা, মা যেও না! আরেকটু দাঁড়াও!' চিৎকার করে উঠলাম।

'কি, বল।'

আমার মনে হলো, মাকে যদি এখন বলে দিই, কিভাবে মারা গেছে সে, তাহলে হয়তো আর মারা যাবে না। ভয়াবহ সেই

সকালটা এড়াতে পারবে। যদি পারে, নিয়তি বদলে যাবে তার। মারা আর যাবে না।

কিন্তু কোন ভাবেই কি নিয়তি বদলাতে পারে মানুষ? অতীতকে পরিবর্তন করে ভবিতব্য এড়াতে পারে?

চেষ্টা করে দেখতে দোষ কি? মাকে সাবধান করে দেয়ার জন্যে বললাম, 'মা, শোনো, খুব জরুরী একটা কথা বলি তোমাকে।'

'কি, মণি?'

'জুলাইয়ের পাঁচ তারিখে তোমার অফিসে আগুন লাগবে...'

তাড়াতাড়ি আমার মুখে হাত চাপা দিল মা, কথা বলতে দিল না। 'না না, আমি শুনতে চাই না,' কেঁপে উঠল তার গলা। 'আমার অনেক কাজ, রিটা; আমাকে এক জায়গায় যেতে হবে।'

'আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও, মা,' ককিয়ে উঠলাম। 'তোমাকে ছাড়া আমার আর দিন কাটে না। তুমি যেখানেই যাও, সেটা যদি পরকালও হয়, নিয়ে যাও আমাকে।'

'না, মণি, তা হয় না। তোর এখানে অনেক কাজ বাকি। ছবির বাকি ছেলেমেয়েগুলোকে খুঁজে বের করতে হবে তোকে। ডানার মত ওদেরকেও যদি ধরে নিয়ে গিয়ে থাকে, উদ্ধার করে আনতে হবে। যে অসামান্য ক্ষমতা রয়েছে তোর, প্রয়োজনে সেটা প্রয়োগ করবি। বুদ্ধি করে চললে ওরা যত শক্তিশালীই হোক, তোর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। বেঁচে যেতে পারবি।'

'কিন্তু তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে চাই না। তুমি নেই, আমার দিনগুলো বড় কষ্টে কাটে...'

'কে বলল নেই?' হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরল মা। তার কাঁধে মুখ লুকালাম। 'আমার অনেক কিছু তোর মধ্যে ভরে দিয়েছি। তোর মনের ক্ষমতা প্রয়োগ করবি। নিজের ভেতরের আয়নার দিকে তাকাবি। দেখতে পাবি আমাকে।'

আমাকে ছেড়ে দিল মা। চোখ মেললাম না। তার পারফিউমের গন্ধ নাকে আসছে আমার। হয়তো শেষবারের জন্যে।

অবশেষে কেটে গেল ঘোর। চোখ মেলে দেখলাম, মা নেই ঘরে।

দরজার বাইরে পদশব্দ। ভাবলাম, মা চলে যাচ্ছে ওদিক দিয়ে। দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে বেরোলাম।

মা নয়, বাবাকে আসতে দেখলাম। আমাকে উত্তেজিত দেখে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, রিটা?'

'অ্যাঁ!...না, কিছু না!'

'গালে পানি কেন তোর? কেঁদেছিস?'

'না, কই? কাঁদিনি তো।'

'কেঁদেছিস। নিশ্চয় মা'র জন্যে মন খারাপ লাগছিল।...যাই, বলে দিই ওকে, তোর শরীর ভাল নেই, এখন আর দেখা হবে না।'

'কাকে, বাবা?'

'আরে ওই পুলিশ অফিসারটা। ডেরিয়াল। এসে বসে আছে, তোর সঙ্গে নাকি কি জরুরী কথা আছে।'

এই এক বিরক্তি! সেদিনের পর থেকে, অর্থাৎ বনের মধ্যের সেই ঘটনাটার পর থেকে মাঝে মাঝেই এসে আমার সঙ্গে দেখা করে লোকটা। ইনিয়ে-বিনিয়ে একটা কথাই জানতে চায়: কি ভাবে ছেলেগুলোকে কাবু করলাম আমি?

বাবাকে বললাম, 'যাও, শরীর খারাপই বলে দাও। এখন দেখা করতে পারব না আমি।'

*

শেষ হলো রিটার ডায়েরী। মুখ তুলে তাকাল রবিন। তার পড়া শেষ হবার পরেও দীর্ঘ একটা মুহূর্ত কেউ কোন কথা বলল না।

হঠাৎ ঝটকা দিয়ে উঠে দাঁড়াল জিনা। 'চলো।'

'কোথায়?' অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল মুসা।

'রিটাদের বাড়িতে।'

'এখন!'

'হ্যাঁ, অসুবিধে কি? ডায়েরীটাও ফেরত দেব আর কিশোরের ব্যাপারে কি করা যায়, সেটাও আলোচনা করব।'

'তারমানে,' রবিন বলল, 'তুমি বিশ্বাস করেছ রিটার কথা?'

'নিজের ডায়েরীতে কেউ মিছে কথা লেখে না। তা ছাড়া কত রকমের উদ্ভট ঘটনা ঘটে পৃথিবীতে, তার হিসেব রাখে কে? চোখের সামনে যা যা দেখতে পাই আমরা, সে-সব ছাড়াও আরও বহু কিছু আছে–ব্যাখ্যার অতীত, যেগুলো নিয়ে মাথা ঘামাতে গেলে পাগল হয়ে যাওয়া লাগবে।'

'বাপরে!' হেসে বলল রবিন। ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'একেবারে কিশোরের মত লেকচার শুরু করে দিলে।' ডায়েরীটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল সে। 'চলো। যাই।'

পনেরো

বেডরুমের দরজায় টোকা শুনে উঠে গেল রিটা। খুলে দিল।

বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। 'রিটা, অফিসার ডেরিয়াল তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। রান্নাঘরে বসিয়ে রেখে এসেছি। কফি খাচ্ছে।'

'কেন?'

'কি জানি, কি একটা ফর্ম নাকি পূরণ করতে হবে বলল। ওই যে সেদিন, বনের মধ্যে গোলমালটা করল–ছেলেগুলোকে নাকি

কোর্টে নিয়ে যাচ্ছে। তোর ফর্মটা কোর্টে দাখিল করতে হবে।'

ঠোঁট কামড়াল রিটা। কি যেন ভাবল। 'বেশ, যাও, আমি আসছি। কাপড়টা বদলে আসি।'

মিস্টার গোল্ডবার্গ চলে গেলেন।

সিঁড়িতে তাঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে যাবার অপেক্ষা করল রিটা। তারপর দৌড়ে এসে ঢুকল দোতলার হলরুমে, টেলিফোনটা যেখানে। ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ডায়াল করল রবিনদের বাড়ির নম্বরে।

'হালো, কে, রবিন?...ও, আমাদের বাড়িতে আসছিলে?... শোনো, আসার দরকার নেই। আপতত বাড়িতেই থাকো। সেই লোকটা, অফিসার ডেরিয়াল এসে বসে আছে। আমাকে থানায় নিয়ে যেতে চায়। কিসের ফর্ম নাকি পূরণ করতে হবে। আমার সন্দেহ লাগছে। কথা বলে আসি। আবার ফোন করব তোমাকে।'

ডেরিয়ালের সঙ্গে কথা বলে সন্দেহজনক তেমন কিছু বুঝতে পারল না। কিন্তু মনটা খুঁতখুঁত করতেই থাকল তার।

আবার ওপরতলায় এসে রবিনকে ফোন করল সে। বলল, 'আমি থানায় যাচ্ছি।'

'ঠিক আছে, যাও। সাবধানে থেকো। থানায় গিয়েই একটা ফোন কোরো। আমরা ফোনের পাশে রইলাম।'

*

কয়েক মিনিট পর একটা পুলিশ ক্রুজারের পেছনে বসে রওনা হলো রিটা। অস্বস্তিটা কোনমতেই তাড়াতে পারল না মন থেকে। অফিসার ডেরিয়ালই ওকে পেছনে বসতে বলেছে, নিরাপত্তার খাতিরে। কেবলমাত্র পুলিশম্যানেরাই নাকি সামনে বসে।

পেছনের সীটটা বানানো হয়েছে অপরাধীদের জন্যে। দরজার হাতল নেই, জানালার বাটন বা লক নেই। ড্রাইভারের সীট থেকে পেছনের সীটটাকে আলাদা করে রেখেছে প্লাস্টিক আর ধাতুর তৈরি গ্রিল। ছোটখাট একটা হাজতের মত লাগছে রিটার কাছে।

'কোন অসুবিধে হচ্ছে?' রিটার অস্বস্তিটা টের পেয়েই যেন জিজ্ঞেস করল ডেরিয়াল।

'না, হচ্ছে না, অফিসার।'

'শুধু ডেরিয়াল বললেই চলবে। ঘুরে যেতে অনেক রাস্তা, দেখি, শর্টকাটে যাই। অনেক সময় বাঁচবে তাতে।'

কোন্‌দিক দিয়ে যাবে না যাবে, সেটা ডেরিয়ালের ইচ্ছে। রিটা আর কি বলবে। চুপ করে রইল।

মোড় নিয়ে সরু একটা নির্জন, পরিত্যক্ত রাস্তায় নামল ডেরিয়াল।

অস্বস্তিটা বাড়ল রিটার। দুই ধারে কোথাও চষা খেত, কোথাও বন। বাড়িঘরের চিহ্ন নেই।

পনেরো মিনিট পর যখন বন আরও ঘন হতে দেখল, আর জিজ্ঞেস না করে পারল না সে, 'এদিক দিয়ে কি সত্যি বেরোনো যাবে?'

জবাব পেল না। হঠাৎ করে চুপ হয়ে গেছে ডেরিয়াল।

আবার জিজ্ঞেস করল রিটা।

ভারী গলায় জবাব দিল ডেরিয়াল, 'বেরোনো যাবে, কিন্তু আমি থানায় যাব না। সন্দেহটা ঠিকই করেছ তুমি। পালাতে আর পারবে না, ডেলটা গার্ল। ধরা পড়ে গেছ।'

'ডেলটা গার্ল!'

'কেন, জানো না নাকি? তুমিও ডেলটাদের একজন। অসামান্য ক্ষমতাধর। কিন্তু আজ আর কিছু করতে পারবে না তুমি।'

'ডেলটাদের একজন মানে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'না পারার তো কথা নয়। মাত্র সেদিনই তো কিশোর পাশার নকল একজন ডেলটা এসেছিল। ওর নাম এজেন্ট নিমো। মিশন সাকসেসফুল না করেই চলে যেতে হয়েছে তাকে।'

'এখন আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?'

'গেলেই দেখতে পাবে।'

চুপ হয়ে গেল ডেরিয়াল।

বিপদটা আঁচ করতে পারল রিটা। ডানা হিউগ্রি আর কিশোর পাশার মত তাকেও হয়তো উধাও করে দেয়া হবে।

পালানোর কথা চিন্তা করতে লাগল সে। জানালা দিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়া যাবে? উঁহু! এটা মিনি-হাজত। এখান থেকে বেরোনো অসম্ভব। সেজন্যেই এ রকম জায়গায় তাকে বসতে দিয়েছে ডেরিয়াল।

হঠাৎ মনে পড়ল ওদের ভলভো গাড়িটার কথা। সে-রাতে রাস্তার মাঝে রহস্যময়ভাবে ডেড হয়ে গিয়েছিল। মনে পড়ল, মা'র কথা। মা বলেছে: যে অসামান্য ক্ষমতা রয়েছে তোর, প্রয়োজনে সেটা প্রয়োগ করবি। কি ক্ষমতার কথা বলেছে মা, বুঝে গেছে রিটা। ব্যাটারি থেকে শক্তি শুষে নিয়ে নিজের শরীরে স্টোর করতে পারে সে। পরে সেটা ব্যবহার করে শত্রুকে নাস্তানাবুদ করে দিতে পারে। ভলভোর ব্যাটারি থেকে নিজের অজান্তে শক্তি শুষে নিয়ে সেদিন চার্জশূন্য করে দিয়েছিল বলেই থেমে গিয়েছিল ইঞ্জিন। সেই শক্তি পরে ব্যবহার করেছে ছেলেগুলোর ওপর।

হাসি ফুটল রিটার মুখে।

চোখ বন্ধ করে ধ্যানের জগতে চলে গেল সে। আশ্চর্য এক শক্তি অনুভব করতে শুরু করল শরীরে। রেডিওটা বাজতে বাজতে হঠাৎ চুপ হয়ে গেল। মাঝপথে অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন। মরে গেল যেন গাড়িটা।

ঝটকা দিয়ে ফিরে তাকাল ডেরিয়াল। গর্জে উঠল, 'জলদি ইঞ্জিন চালু করো!'

চিৎকার শুনে চমকে চোখ মেলল রিটা।

'তাড়াতাড়ি করো!' আবার চিৎকার করে উঠল ডেরিয়াল। 'ব্যাটারির চার্জ ফিরিয়ে দাও!'

'রাগটা কমান,' শান্তকণ্ঠে বলল রিটা। 'কপালের রগ ছিঁড়ে

যাবে তো।'

'তোমাকে জ্যান্ত ধরে নিয়ে যাবার আদেশ আছে আমার ওপর,' দাঁতে দাঁত চেপে বলল ডেরিয়াল, 'কিন্তু জখম না করার কথা বলেনি।'

জানালার বাইরে তাকাল রিটা। এখনও বুনো অঞ্চলে রয়েছে। আর কোন গাড়ির চিহ্নও চোখে পড়ল না।

'আপনাকে তিনটে শব্দ বলার আছে আমার।'

'কি?'

'ধরতে পারলে ধরুন!' বলেই গাড়ির দরজার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল রিটা। ছরছর করে গোলাপী রঙের স্ফুলিঙ্গ-বৃষ্টি শুরু হলো যেন। দপ করে জ্বলে উঠল কমলা আগুন। প্রচণ্ড শক্তির কাছে হার মানতে বাধ্য হলো দরজাটা। কব্জা, লক সব ভেঙে খুলে গিয়ে ছিটকে পড়ল বাইরে। এক লাফে গাড়ি থেকে বেরিয়ে বনের দিকে দৌড় দিল সে।

পিছু নিল ডেরিয়াল।

রিটার চেয়ে শক্তিশালী সে। দ্রুতগতি। মাথা না খাটালে কয়েক মিনিটের মধ্যেই ধরা পড়ে যাবে, বুঝে গেল রিটা। প্রাণপণে ছুটতে ছুটতে কি করা যায় বুদ্ধি বের করার চেষ্টা করল।

সামনে তারের বেড়া দেখা গেল। সাইনবোর্ডে লেখা:

খাবার পানি সরবরাহ কেন্দ্র।
সর্বসাধারণের প্রবেশ নিষেধ।

ওই বেড়া ডিঙানো কোন ব্যাপারই না তার জন্যে।

সাইনবোর্ডের নির্দেশ অমান্য করল সে। কাঠবিড়ালীর মত বেড়া বেয়ে উঠে লাফিয়ে নামল অন্যপাশে। ফিরে তাকিয়ে দেখল, চোখ দুটো আর স্বাভাবিক মানুষের মত নেই ডেরিয়ালের। অদ্ভুত আকৃতি হয়ে গেছে। গোল গোল চাকতি। হীরার দ্যুতির মত রাগের আগুন বেরোচ্ছে যেন ও দুটো থেকে। 'দৌড়ে কোন লাভ হবে না, মেয়ে। পালাতে পারবে না আমার হাত থেকে।'

জবাব না দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রিটা। দৌড়ে ঢুকে পড়ল আবার বনের মধ্যে।

ডেরিয়ালের বেড়া ডিঙানোর শব্দ কানে এল। ছুটে আসছে দ্রুত।

নাহ্, পালানো সম্ভব না। পাল্টা আঘাত হানার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল রিটা। একটা বুদ্ধি এসেছে মাথায়। সামান্য ঘুরে কিছুটা সরে গিয়ে ফিরে চলল বেড়ার দিকে।

আবার বেড়া ডিঙিয়ে অন্যপাশে চলে এল। না দৌড়ে আর, দাঁড়িয়ে রইল।

দেখতে পেল ডেরিয়ালকে। ছুটে এসে তাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো ডেরিয়াল। থামল না। এ পাশে আসার জন্যে তরতর করে বেড়া বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল।

গাড়ির ব্যাটারি থেকে সংগ্রহ করা অবশিষ্ট শক্তিটুকু বেড়ার ওপর প্রয়োগ করল রিটা। মুহূর্তে গোলাপী আলোর ফুলঝুরি শুরু হলো। সেই সঙ্গে আঁকাবাঁকা রঙিন আলোর সরু সরু বিদ্যুতের সাপ নাচানাচি শুরু করল বেড়ার গায়ে। হাই ভোল্টেজের ভয়ানক বৈদ্যুতিক শক হজম করতে পারল না ডেরিয়াল। চিৎকার দিয়ে পড়ে গেল মাটিতে। যে ভাবে পড়ল, সে-ভাবেই রইল, নড়ল না আর।

মরল কি বাঁচল, দেখারও সময় নেই রিটার। শত্রুকে কাবু করে আর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না। ছুটতে শুরু করল।

ষোলো

মলে এসে যখন পৌঁছল সে, সারা গা বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝরছে। দাঁড়াতে পারছে না। পরিশ্রমে থরথর করে কাঁপছে শরীর। খাবার দরকার? না, খিদে তো বোধ করছে না। বুঝল, কি জিনিস দরকার তার।

ব্যাটারি! রিচার্জ করতে হবে দেহটাকে। ব্যাটারিশূন্য হয়ে গেছে একেবারে।

পথে একটা বুদ থেকে রবিনদের মলে আসতে ফোন করে দিয়েছে। এখানে লোকের ভিড়ে ডেরিয়াল বা তার দলের লোকেরা এসে আঘাত হানতে সাহস করবে না। নিরাপদে কথা বলা যাবে।

টলতে টলতে মলে ঢোকার গেটের দিকে এগোল রিটা। দিগন্তরেখার দিকে ঝুঁকে পড়েছে সূর্য। পার্কিং লটে বিরাট লম্বা ছায়া পড়েছে রিটার।

বিকেল শেষ হয়ে আসছে। কতক্ষণ ধরে দৌড়েছে সে? অনন্তকাল!

একটা খেলনা ঘোড়ার ওপর বসে কাঁদছে তিন বছরের একটা বাচ্চা। সারা মুখ আইসক্রীমে মাখামাখি। আরও আইসক্রীমের জন্যে কাঁদছে বোধহয়। ওকে ঘোড়ায় বসিয়ে নিশ্চয় কোন কিছু কিনতে গেছে মা। রিটার দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে গেল বাচ্চাটা।

কারণটা বুঝতে সময় লাগল না রিটার। খাড়া খাড়া হয়ে গেছে চুল। কাপড় ছেঁড়া। কাদায় মাখামাখি সারা গা। হরর ছবির ভূত। নিশ্চয় বাচ্চাটা তাকে ভূতই মনে করেছে।

কেয়ার করল না রিটা। মলের দিকে এগোল। কিন্তু পা তুলতে পারছে না আর। খেলনা ঘোড়ার কয়েন বক্সটায় হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

মুহূর্তে শক্তি ছড়িয়ে পড়তে শুরু করল শরীরে। ছলকে উঠল রক্তস্রোত। চুলগুলো স্বাভাবিক হয়ে এল।

কয়েকবার জোরে জোরে ঝাঁকি দিয়ে আচমকা থেমে গেল ঘোড়াটা। ডেড। মেশিনের ব্যাটারি আবার রিচার্জ না করলে আর চলবে না।

ঘোড়া থামতেই আবার চিৎকার করে কেঁদে উঠল বাচ্চাটা।

হাঁটতে শুরু করল রিটা। মলে ঢুকল।

দেখল, ওর আগেই এসে বসে আছে রবিন। ভিডিও গেমের দোকানের সামনে অস্থির ভাবে পায়চারি করছে। রিটার দিকে তাকিয়ে বড় বড় হয়ে গেল চোখ। হাঁ করে তাকিয়ে রইল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত। তারপর এগিয়ে এল।

'জিনা আর মুসা কোথায়?' জানতে চাইল রিটা।

'দোকানের ভেতর।'

'গেম খেলছে?'

'না। সবাই একসঙ্গে থাকিনি, নিরাপত্তার জন্যে। কে কোন্‌খান থেকে নজর রেখেছে বলা মুশকিল। বুঝতে পারছি শত্রুর চোখ রয়েছে আমাদের ওপর। তাই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছি। আমি তোমার অপেক্ষাই করছিলাম।' রিটার ওপর নজর বোলাল রবিন। 'কিন্তু তোমার অবস্থা তো শোচনীয়। কি হয়েছিল?'

'আগে বাথরুম থেকে আসি। লোকে কিভাবে তাকাচ্ছে দেখছ না? কাদামাটিগুলো ধুয়ে আসি।'

'দাঁড়াও, আমরাও আসি তোমার সঙ্গে।' জিনা আর মুসাকে ডাকতে ভেতরে ঢুকে গেল রবিন।

ওরা তিনজন বেরিয়ে আসার পর পরই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। মিটমিট করে উঠল মলের সমস্ত আলো।

'খাইছে!' অবাক হয়ে রিটার দিকে তাকাল মুসা। 'তুমি করছ?'

নীরবে মাথা নাড়ল রিটা। সে-ও অবাক।

একসঙ্গে নিভে গেল সমস্ত আলো। যে ভাবে নিভল, তাতে মনে হয় মেইন লাইন জ্বলে গেছে। কোথায় খারাপ হয়েছে, সেটা বের করে, সারিয়ে-সুরিয়ে আবার আলো জ্বালতে প্রচুর সময় লাগবে। বাইরে সূর্যও ডুবতে বসেছে। গোলাপী-কমলা আলোর খেলা ম্লান করে দিয়ে দ্রুত এগিয়ে আসছে নীলচে-ধূসর গোধূলি।

বাতি নিভে যাওয়ায় মল জুড়ে শুরু হলো চিৎকার চেঁচামেচি। লুটপাটের ভয়ে তাড়াতাড়ি শাটার নামিয়ে দিতে শুরু করল দোকানদাররা। করিডরে ছোটাছুটি করছে লোকে। হলে উদ্বিগ্ন ক্রেতার ভিড়। কি হয়েছে জানতে চাইছে সবাই।

কালো পোশাক পরা চারজন গার্ডের আবির্ভাব ঘটল এ সময়। কালো সানগ্লাস, কালো শার্ট, কালো প্যান্ট, কালো বেজবল ক্যাপ নিয়ে অন্ধকারে চমৎকার ভাবে মিশে যাওয়ার সুযোগ হলো ওদের। তবে হাতে টর্চ আছে চারজনেরই।

'এদিক দিয়ে আসুন, প্লীজ,' টর্চের আলো নেড়ে উত্তেজিত ক্রেতাদের পথ দেখাল একজন। 'ঘাবড়াবেন না। আসুন।'

দ্রুত সাড়া দিল লোকে। পথ দেখিয়ে সবাইকে গেটের দিকে নিয়ে চলল গার্ডেরা।

সারির পেছনে রইল চার গোয়েন্দা।

'গার্ডগুলোকে সন্দেহ হচ্ছে আমার,' নিচুস্বরে রবিন বলল। 'দেখছ, কেমন টর্চের আলো ফেলছে সবার মুখে? কাউকে খুঁজছে ওরা।'

'আমাদের!' রিটার কণ্ঠে শঙ্কা।

'তাই তো!' জিনা বলল। 'দেখো, চোখ থেকে সানগ্লাস খুলছে না ওরা। তারমানে চোখ দেখলেই চমকে যাবে লোকে। বনের মধ্যে সে-রাতে নকল কিশোরের চোখ কি রকম ছিল মনে আছে?'

'ঠিক,' মুসাও একমত। 'অন্ধকারে সানগ্লাস পরে আছে কেন নাহলে?'

'তারমানে ওদের চোখে পড়া চলবে না,' উদ্বিগ্ন শোনাল রবিনের কণ্ঠ। 'পালাতে হবে। সরে যেতে হবে কোনদিকে।'

'কিন্তু ভেতরে তো অন্ধকার,' রিটা বলল। 'দেখতে পাব না কিছু। তা ছাড়া আরও গার্ড থাকতে পারে। ব্লাউজ চুরি করেছি ভেবে আমাকে সেদিন যারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তাদের কেউ থাকলে মহা মুশকিলে ফেলে দেবে।'

'তাহলে!' চিন্তায় পড়ে গেল রবিন। যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। দ্রুত বেরিয়ে যাচ্ছে সামনের লোকগুলো। ছোট হয়ে আসছে সারি।

হঠাৎ একজন গার্ড আলো ফেলল ওদের দিকে। দীর্ঘ একটা মুহূর্ত স্থির হয়ে রইল আলোটা। সঙ্গীদের কিছু বলল বোধহয় লোকটা। একসঙ্গে চারটে আলো এসে পড়ল ওদের মুখে।

আর কোন উপায় নেই। চিৎকার করে উঠল রবিন, 'পালাও!'

সতেরো

গেট ছেড়ে দৌড় দিল চার গার্ড। তাড়া করল ওদের।

ছুটতে ছুটতে রিটা বলল, 'ছোটাছুটি করে লাভ হবে না। পালাতে পারব না। ওদের ক্ষমতা অসীম। আমরা আছি, জেনে গেছে। না ধরে আর ছাড়বে না।'

মলের মেইন গেট লাগানোর শব্দ শোনা গেল।

'ওই যে,' মুসা বলল, 'গেট লাগিয়ে দিচ্ছে। খাঁচার মধ্যে

আটকে ফেলে ধরবে আমাদের।'

'ছুটতে থাকো,' রবিন বলল। 'থেমো না।'

'কিন্তু এ ভাবে দৌড়ে কিছু হবে না তো,' জিনা বলল। 'একটা বুদ্ধি বের করা দরকার আমাদের।'

সামনে আরেকটা বড় দরজা। ওটার অন্যপাশে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়াল রিটা। খেলনা ঘোড়াটার ব্যাটারি থেকে যেটুকু শক্তি সঞ্চয় করেছিল, সেটা ব্যবহার করে লাগিয়ে দিল ইলেকট্রনিক দরজাটা। গার্ড আর ওদের মাঝে ভারী একটা প্রতিবন্ধকতা তৈরি হলো।

বন্ধুদের দিকে ফিরে তাকাল রিটা। 'এটা দিয়েও ঠেকানো যাবে না ওদের। দু'মিনিট। বড় জোর তিন।'

মাঝেসাঝেই মলে কেনাকাটা করতে আসে জিনা। তার দিকে তাকাল রবিন। 'জিনা, পেছন দিকে বেরোনোর দরজা-টরজা আছে, বলতে পারবে?'

'এ তলায়? উঁহু,' জবাব দিল জিনা। 'এসকেলেটরটা রয়েছে মেইন গেটের দিকে।'

'না, ওদিকে যাওয়া যাবে না। রিস্‌কি হয়ে যাবে।'

রিটাও বহুবার এসেছে এই মলে। জিনার চেয়ে কম চেনে না। বরং বেশিই চেনে। কোথায় কোথায় কি আছে মনে করার চেষ্টা করল। 'পেছন দিয়ে বেরোনোর পথ নেই। তবে একটা বিকল্প আছে!' প্রায় চিৎকার করে উঠল সে, 'শূ এলিভেটর!'

'কি?' বুঝতে পারল না মুসা।

'অনেকটা ডাম্বওয়েইটারের মত কাজ করে ওটা,' জবাব দিল রিটা। 'জুতো বয়ে আনে।'

'শুধু কিছু জুতো বওয়ানোর জন্যে একটা এলিভেটর বানিয়ে ফেলেছে ওরা?' অবাক না হয়ে পারল না রবিন।

'হ্যাঁ, বানিয়েছে। তবে কিছু জুতো নয়, অনেক,' রিটা বলল। 'যে জুতোটা তোমার পছন্দ, জানাবে সেলসম্যানকে, মিনিটের

মধ্যে ওই মিনিএলিভেটরে করে এসে হাজির হবে তোমার জুতো।'

'ভাল বুদ্ধি করেছে,' প্রশংসা করল রবিন।

'জুতো কিনতে আসিনি আমরা,' মনে করিয়ে দিল মুসা। 'কাজেই এলিভেটরের প্রশংসা না করে ওটা দিয়ে কাজটা কি হবে সেটা জানতে পারলে ভাল হয়।'

রিটার কথা বুঝে গেছে রবিন। তুড়ি বাজিয়ে বলল, 'ঠিক! রিটা, ঠিক! তোমার বুদ্ধি আছে!'

'নাহ্, নেতৃত্ব পেলেই এরা সবাই কিশোর পাশা হয়ে যায়!' তিক্তকণ্ঠে বলল মুসা। 'দুর্বোধ্য কথাবার্তা! মূল্যবান সময় নষ্ট না করে বলেই ফেলো না ছাই কি বলতে চাও।'

'বুঝতে পারছ না? জুতো বয়ে আনে, তারমানে ওটার সার্বক্ষণিক অবস্থান হলো স্টোরের মধ্যে। যে তলায় স্টোর আছে সেই তলায় রাখা হয় ওটা।' রিটাকে জিজ্ঞেস করল রবিন, 'রিটা, আমাদের ভার বইতে পারবে ওটা?'

জিনাও দেখেছে এলিভেটরটা। 'জুতো বয়ে আনার জিনিস, মানুষের ভার বইতে পারবে না। তবে ওটা খুলে নিয়ে শ্যাফট্‌টা ব্যবহার করতে পারব আমরা।'

'জলদি এসো!' ছোটার গতি বাড়িয়ে দিল রবিন।

এলিভেটরটা খুঁজে পাওয়া কঠিন হলো না। ছোট বাক্সমত কারটা খোলার চেষ্টা করে দেখল সে। খুলল না। অত সহজ হবে না খোলা।

সবাই মিলে চেষ্টা করতে লাগল। খুলল অবশেষে।

খুলে ওটা নামিয়ে রাখল ওরা, এই সময় বিকট শব্দ হলো পেছনে। কোন কিছু ভেঙে পড়েছে। ফুটখানেক পুরু, পনেরো ফুট উঁচু ভারী দরজাটাই হবে।

'গেল লাখ লাখ ডলারের দরজাটা,' মুসা বলল।

'ভাঙল কি করে!' জিনা অবাক।

'ওরা মানুষ নয়, আগেই তো বলেছি,' রিটা বলল। 'ওদের ক্ষমতা অসীম।'

সামনের এলিভেটরের শ্যাফট্‌টার দিকে তাকাল সবাই। চৌকোনা লম্বা একটা গর্ত। চওড়া খুব বেশি না। তবে একবারে একজন করে ঢুকতে পারবে।

গার্ডদের ছুটন্ত পায়ের শব্দ কানে এল।

'আগে আমি যাচ্ছি,' মুসা বলল। 'দেখি, নিরাপদ কিনা।'

কে আগে যাবে সেটা নিয়ে তর্ক করার সময় নেই। 'নিচে নেমে আমাদের জন্যে অপেক্ষা কোরো না,' রবিন বলল। 'দৌড়াতে শুরু করবে। ভাগাভাগি হয়ে একেকজন একেকদিকে চলে যাওয়াটাই ভাল। সবাইকে একসঙ্গে ধরা পড়তে হবে না।'

আইডিয়াটা খারাপ লাগল না রিটার। কিন্তু অন্ধকারে একা হয়ে যাওয়ার কথাটা ভাবতেও ভাল লাগল না।

*

শ্যাফট্ বেয়ে নেমে চলেছে রিটা। দুই হাতের তালু দুই দেয়ালে এমন শক্ত করে চেপে রেখেছে যাতে পড়ে না যায়। কোন কারণে হাতের চাপ ঢিল হলেই বিশ ফুট নিচের কংক্রীটের মেঝেতে গিয়ে পড়তে হবে।

স্টোররুমে নেমে এল সে। সবাই ওর আগে নেমে গেছে। ওপরে প্রচণ্ড শব্দ। ভাঙচুর করছে গার্ডেরা। শ্যাফট্‌টা ওদের নজরে পড়তে দেরি হবে না। পড়লেই বুঝে যাবে সব।

'রবিন!' অন্ধকারে ফিসফিস করে ডাকল রিটা। 'মুসা! জিনা!'

জবাব নেই। পরিকল্পনা অনুযায়ী যার যার পথে চলে গেছে ওরা নিশ্চয়।

ভারী দম নিল রিটা। কম্পিত নিঃশ্বাস।

হাতড়াতে হাতড়াতে এগোতে শুরু করল সে। হাতে লাগছে জুতোর সারি। অবশেষে একটা ধাতব স্পর্শ পেল। দরজা। আস্তে

করে ঠেলে খুলে বেরিয়ে এল।

নিচতলাটা ওপরের চেয়ে অনেক বেশি অন্ধকার মনে হয়। তবে এতবার এসেছে এ জায়গায়, মুখস্থ হয়ে গেছে, অনুমানের ওপর নির্ভর করে এগোতে পারল তাই।

কিন্তু যাবে কোথায়?

যেখানেই যাক, সে জানে, লোকগুলো তাকে খুঁজে বের করে ফেলবে। ভেতরে খুঁজছে চারজন। মেইন গেটের কাছেও নিশ্চয় আরও অনেকে অপেক্ষা করছে।

বনবন করে ভাবনার চাকাগুলো ঘুরতে আরম্ভ করল তার।

কি করা যায়? টাইম-জাম্প করে লাভ হবে? তাহলে আর ওরা ধরতে পারবে না তাকে। তেরো বছর যদি পিছিয়ে চলে যায়, কি করে খুঁজে পাবে! কিন্তু সময়-ভ্রমণে অভ্যস্ত নয় এখনও সে। কিভাবে নিজে নিজে যাতায়াত করতে হয়, জানে না।

ব্লাউজটা দরকার। যেটাতে প্রোগ্রামিং করা আছে ১৯৮৭ সাল। কিন্তু নেই ওটা সঙ্গে। ডেরিয়ালের সঙ্গে বেরোনোর সময় গায়ে দেয়ার প্রয়োজন মনে করেনি। আচ্ছা, মনোনিবেশ করার জন্যে একমাত্র ব্লাউজটাই কি দরকার? বিকল্প কিছুতে কাজ হবে না? চকিতে মাথায় এসে গেল ছবিটার কথা। চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

করিডরের শেষ মাথায় অন্ধকারের মধ্যে আবছা ধূসর একটা চৌকোনা বস্তুর মত চোখে পড়ল মেইন গেটটা। জুতো খুলে ফেলে নিঃশব্দে পা টিপে টিপে এগোল সে। কাছে এসে দেখল, তার অনুমান ঠিক। গেটের কাছে পাহারা দিচ্ছে একজন গার্ড।

লোকটা তাকে দেখতে পাওয়ার আগেই ইনফরমেশন কিসকের কাছে সরে গেল রিটা। হাত বাড়িয়ে খুলে আনল দেয়ালে টানানো নিজের ছবিটা। গার্ড-ইন-চার্জকে তখন পায়ে হাত দিয়ে সালাম করতে ইচ্ছে হলো তার, ছবিটা ওখানে টানানোর

জন্যে।

এত অন্ধকার এখানে, ছবি দেখাটা খুব কঠিন। কাউন্টারের কাছ থেকে সরে এল, যেখানে কাঁচের দরজার ভেতর দিয়ে অতি সামান্য আবছা আলো চুইয়ে প্রবেশ করছে। দেখতে পেল ছবিটা। ব্লাউজের ওপর কেন্দ্রীভূত করল দৃষ্টি। কল্পনায় দেখতে শুরু করল ব্লাউজ পরা অবস্থায় তার নিজের ছবি। অদ্ভুত এক অনুভূতি হলো। দাঁড়িয়ে যাচ্ছে ঘাড়ের রোম।

তারমানে কাজ হচ্ছে!

মাথার ওপরে গুঞ্জন শুরু হলো।

মুখ তুলে তাকে দেখে ফেলল গার্ড।

ওয়াকি-টকিতে মুখ লাগিয়ে চিৎকার করে উঠল সে, 'টার্গেট এখানে!'

দৌড়াতে শুরু করল লোকটা। বিশ গজ দূরে রয়েছে। দ্রুত চলে আসছে কাছে।

সময়ের দরজা সময়মত খুলবে কিনা বুঝতে পারছে না রিটা। ছবিটা শক্ত করে চেপে ধরল। গুঞ্জন বাড়ছে।

কঠিন কয়েকটা আঙুল চেপে ধরল তার কাঁধ। কথা বলে উঠল যান্ত্রিক একটা কণ্ঠ, 'এবার যাবে কোথায়!'

ফিরে তাকাল রিটা। কালো সানগ্লাস খুলে ফেলেছে গার্ড। টর্চের আলোর আভায় ভয়ঙ্কর দুটো চোখ দেখতে পেল রিটা।

'ছাড়ুন আমাকে,' নিজের শান্ত কণ্ঠ শুনে নিজেই অবাক হয়ে গেল সে। 'কিছু প্রশ্ন আছে আপনার কাছে।'

'কি প্রশ্ন?' ছাড়ল না গার্ড।

সময় নিতে চাইছে রিটা। গুঞ্জনটা যখন শুরু হয়েছে, 'জাম্প' করতে পারবে বুঝতে পারছে।

দপ করে চোখের সামনে থেকে নিভে গেল টর্চের আলো।

পরক্ষণে উজ্জ্বল দিবালোকে বেরিয়ে এল সে।

চারপাশে তাকাতে লাগল রিটা। দল বেঁধে কেনাকাটা করতে

চলেছে ক্রেতারা। কি ঘটেছে, জানা আছে তার। তারপরেও অবাক না হয়ে পারল না। আবার অতীতে চলে এসেছে। আপাতত ভিনগ্রহবাসী গার্ডদের হাত থেকে বাঁচলেও অল্পক্ষণের মধ্যেই আবার তাকে ফিরে যেতে হবে বর্তমানে। বাইরে যখন বেরোতেই পেরেছে, বাঁচার একটা উপায় করে তবেই আবার ঢুকবে ভবিষ্যতের অন্ধকার মলে।

একটা ইলেকট্রনিক জিনিসপত্রের দোকানে ঢুকল সে। মুখ তুলে তাকাল সেলসক্লার্ক। ডিসেম্বরের শীতে ওর গায়ে গরমের পোশাক দেখে অবাক হয়ে গেল। মিষ্টি করে হেসে তার অবাক ভাবটা কাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রিটা। বলল, 'হালো। আমি কিছু একটা কিনতে চাইছি, বাবার জন্মদিনে উপহার দেয়ার জন্যে।'

*

কয়েক সেকেন্ড পরেই দোকান থেকে বেরিয়ে এল রিটা, পেছনে হাঁ হয়ে থাকা সেলস-ক্লার্ককে রেখে। হতবাক হয়ে দোকানের জিনিসপত্রগুলো দেখছে সে। বুঝতেই পারছে না, হঠাৎ কি এমন ঘটে গেল যে বন্ধ হয়ে গেল চালু করে রাখা রেডিও-টেলিভিশন-অডিও সেটগুলো!

করিডর ধরে দ্রুত এগুলো রিটা। শক্তিতে টইটম্বুর হয়ে আছে দেহ। প্রজাপতির মত পাখা মেলে উড়ে চলেছে যেন।

খেলনার দোকানের পাশ দিয়ে যেতে যেতে আরেকটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। থমকে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল র‍্যাকে রাখা আলট্রা সোকার ওয়াটার গানটার দিকে। খানিক দূরে একটা বাচ্চা ছেলে আরেকটা খেলনা হাতে নিয়ে দেখছে–একটা বড়, চকচকে সবুজ ডাবল-ব্যারেল খেলনা রাইফেল।

এগিয়ে গেল সে। হাত বাড়াল ছেলেটার দিকে, 'দেবে একটু? দেখব।'

এক মুহূর্ত রিটার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে হাত সরিয়ে

নিল ছেলেটা।

'দাও, খোকা,' জোর দিয়ে বলল রিটা। 'তোমার চেয়ে বেশি প্রয়োজন ওটা আমার।'

কাঁধে টোকা পড়তে ফিরে তাকাল রিটা। দোকানের ম্যানেজার। বেজির মত মুখ। সরু কুৎসিত গোঁফ। মুখটাকে গোমড়া করে রেখে জিজ্ঞেস করল, 'জন্মদিনে দেবে?'

'না।'

সময় ফুরিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। ছাতের আলোগুলোর দিকে তাকাল সে। এখনও উজ্জ্বল। মিটমিট শুরু হওয়ার আগেই যা করার করে ফেলতে হবে।

'হুঁ।...যাকগে, কি জন্যে কিনবে সেটা তোমার ব্যাপার।...পছন্দ হয়েছে?' জিজ্ঞেস করল লোকটা।

মাথা ঝাঁকাল রিটা। র‍্যাক থেকে তুলে নিল আলট্রা সোকারটা। একটা শপিং ব্যাগ চেয়ে নিয়ে আরও কতগুলো খেলনা র‍্যাক থেকে নামিয়ে দ্রুত ভরে ফেলল।

'এগুলোর দাম...' বলতে গেল ম্যানেজার।

দরজার দিকে রওনা হয়ে গেছে রিটা। ভেতরে থাকলে আটকা পড়তে হবে।

চিৎকার করে উঠল ম্যানেজার, 'আরে আরে, কোথায় যাচ্ছ...'

কথা শেষ হলো না। মিটমিট করতে লাগল বাতিগুলো। সেই সঙ্গে গুঞ্জন।

দপ করে নিভে গেল বাতি।

আঠারো

ভিন্ন আরেক নাটক চলছে তখন কাচু-পিকচুতে। ভীষণ ক্লান্ত হয়ে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল কিশোর। শরীরের প্রতিটি পেশিতে ব্যথা। কাপড় খুলতেও ইচ্ছে করল না তার।

এত ক্লান্তির পরেও ঘুম এল না। যতবার চোখ বোজে, গলাকাটা গরুটার চেহারা ফুটে ওঠে তার কল্পনায়। ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল গরুর চেহারা, তার জায়গা দখল করল সিসির মুখ।

সিসিকে কেন সন্দেহ করছে ওরা? জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে ভাল আচরণ করে সে, ওগুলোও তাকে পছন্দ করে, তার কথায় সাড়া দেয়। এর মধ্যে অশুভ ক্ষমতাটা কোথায় দেখতে পেল লোকে?

হঠাৎ ঝটকা দিয়ে উঠে বসল বিছানায়। ঘোড়ার খুরের শব্দ।

গায়ের ওপর থেকে চাদরটা টান মেরে সরিয়ে ফেলে বিছানা থেকে নেমে পড়ল। বুকের মধ্যে কাঁপুনিটা বেড়ে গেছে। জানালার কাছে এসে বাইরে উঁকি দিল।

চোখে পড়ল দলটাকে। দম আটকে আসতে চাইল।

সামনের আঙিনায় ঘুরে বেড়াচ্ছে ওরা। কতজন? পাঁচ...দশ...বারো? নাকি আরও বেশি?

রাতের অন্ধকারে ছায়ার মত নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

কি চায়? শেষ পর্যন্ত হুমকিটা কার্যকর করতেই কি চলে এল?

সিসিকে খুন করতে?

পেছনের কাঠের মেঝেতে শব্দ হতে পাক খেয়ে ঘুরে দাঁড়াল

সে।

ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে হেনরি আর সিসি। তাকিয়ে আছে ওর দিকে। আতঙ্কিত।

'ওরা এসে গেছে, তাই না?' কাঁপা ফিসফিসে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সিসি।

জোরে একবার মাথা ঝাঁকি দিল কিশোর, 'হ্যাঁ।'

পাশে এসে দাঁড়াল দুই ভাই-বোন। একসঙ্গে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে তাকাল সবাই। ঘোড়াগুলোর ঘোরাঘুরি বন্ধ হয়েছে। লম্বা সারি দিয়ে দাঁড় করিয়েছে তাদের সওয়ারিরা।

'আজ আরও অনেকগুলো গরুকে মেরে ফেলতে হয়েছে,' চিৎকার করে বলল একজন।

'এর জন্যে দায়ী হচ্ছে ওই ডাইনী মেয়েটা,' জন ফ্রেঞ্চ বলল। ওর স্লিঙে ঝোলানো হাতটাকে লাগছে সাদা তেকোনা নিশানের মত। 'ওকে নামিয়ে দাও। বাকি দুজনকে কিছু করব না।'

কিশোরের গা ঘেঁষে এল সিসি। ওর গায়ের কাঁপুনি টের পাচ্ছে কিশোর। কাঁধে একটা হাত রেখে সান্ত্বনা দিল। তার অন্য হাতটা আঁকড়ে ধরল আতঙ্কিত হেনরি।

'আপনাদের গরুগুলো মারা যাচ্ছে, এ জন্যে সত্যি দুঃখিত আমরা,' জবাব দিল কিশোর। 'এতে সিসির কোন হাত নেই। দয়া করে চলে যান আপনারা। আমাদের একা থাকতে দিন।'

'সব শয়তানির মূলে ওই ডাইনী মেয়েটা,' মার্ক ফ্রেঞ্চ বলল। 'নেকড়ে আর সাপ নিয়ে কি করেছে, সব শুনেছি আমরা। আমাদের সবারই গরু মরছে, তোমাদের একটাও মরে না কেন?...তুমি বাইরের লোক, কিশোর পাশা, তোমার সঙ্গে আমাদের কোন শত্রুতা নেই। মেয়েটাকে পাঠিয়ে দাও এখানে, তোমার কিছু করব না আমরা।'

'জলদি বের করে দাও শয়তানীটাকে!' বলল আরেকজন।

'জীবনেও না!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'আমার প্রাণ

থাকতে নয়!'

'বেশ, মরো তাহলে,' জন ফ্রেঞ্চ বলল। 'তোমাকে একটা সুযোগ দিয়েছিলাম, কিশোর পাশা, নাওনি...'

একটা মশাল জ্বলে উঠল। পটাপট জ্বলে উঠল আরও কয়েকটা। মশাল হাতে ঘোড়ায় চেপে বাড়ির চারপাশে চক্কর দিতে শুরু করল লোকগুলো।

'লাগিয়ে দাও! দেখছ কি?' মার্কের চিৎকার শোনা গেল। 'পুড়িয়ে মারো ডাইনীটাকে!'

বাড়ির দিকে একজনকে মশাল ছুঁড়ে দিতে দেখল কিশোর।

ওপরের বারান্দার একপ্রান্তে এসে পড়ল মশালটা। কিশোরের জানালার সামনে নেচে উঠল আগুন।

চিৎকার করে উঠল সিসি।

'জলদি!' বলল কিশোর, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে হবে আমাদের!' জানালার কাছ থেকে ঠেলা দিয়ে সিসিকে সরিয়ে দিল সে।

হেনরিকে পিঠে তুলে নিয়ে সিসির পিছু পিছু এসে ঢুকল হলওয়েতে। ঝনঝন করে কাঁচ ভাঙছে। জানালা দিয়ে ঘরের ভেতরে মশাল ছুঁড়ে মারছে লোকগুলো। গুলির শব্দ হলো।

সিঁড়ি দিয়ে ধোঁয়া উঠে আসছে কুণ্ডলী পাকিয়ে। থমকে দাঁড়াল সিসি। পেছন থেকে তাকে ঠেলা দিল কিশোর। 'থামলে কেন? আর কোন পথ নেই!'

এলোমেলো পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করল সিসি। হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, ধরে ফেলল তাকে কিশোর। কিশোরের গলা পেঁচিয়ে ধরে পিঠের ওপর ঝুলছে হেনরি।

বাতাসের জন্যে আকুলি-বিকুলি করছে কিশোরের ফুসফুস! ধোঁয়া ঢুকে গেছে। চোখ জ্বালা করছে। কালো ধোঁয়ার মধ্যে দিয়ে কাশতে কাশতে নেমে চলল সিঁড়ি বেয়ে। এলোমেলো পা ফেলছে সে-ও। হেনরির হাতটা ঢিল করার চেষ্টা করল। বরং শক্ত হলো

সেটা আরও। ধোঁয়া থেকে বাঁচার জন্যে মুখ চেপে ধরল কিশোরের কাঁধে। সমানে কাশছে।

মরতেই হবে বোধহয় আজ, ভাবছে কিশোর। কিন্তু এত সহজে হাল ছেড়ে দেয়ার পাত্র সে নয়।

পৌঁছে গেল নিচতলায়। ঘুরছে, পাক খাচ্ছে আগুনের শিখা; ধারাল নখর বের করে থাবা মারছে যেন কাঠের দেয়ালের গায়ে। মাথার মধ্যে দপদপ করছে কিশোরের। ভয়াবহ উত্তাপ ওকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে।

বাঁচতে হলে এখনই বেরিয়ে যেতে হবে।

ধোঁয়ার ভেতর দিয়ে গলা বাড়িয়ে তাকাতে লাগল সে। কোন্‌দিকে যাবে? চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলেছে আগুন।

'সামনের দিকে যাও!' চিৎকার করে উঠল আচমকা। 'সামনের ঘরটা দিয়ে বেরোতে হবে!'

পায়ের কাছে লকলক করছে আগুনের শিখা। পরোয়া করল না। সোজা দৌড় দিল হলওয়ে ধরে সামনের বারান্দার দিকে। দেয়াল থেকে লাফ দিয়ে দিয়ে সামনে এসে পড়ছে আগুন। ওগুলোর চারপাশে নাচানাচি করে বাঁচার চেষ্টা করতে লাগল কিশোর। মুখের চামড়া ঝলসে যাচ্ছে। ঝাঁঝাল ধোঁয়া চোখ পোড়াচ্ছে।

ছেলে-মেয়ে দুটোকে বের করে নিয়ে যেতেই হবে!–বার বার নিজেকে বলছে সে। ওদের বাঁচাতেই হবে।

দাঁড়িয়ে গেছে সিসি। তাকিয়ে আছে আগুনের দিকে। দিনের আলোর মত আলোকিত হয়ে গেছে ঘর। গাল বেয়ে পানি নামছে। কেঁদে ফেলল, 'বেরোনোর জায়গা নেই, কিশোরভাই!'

বুকের মধ্যে হাতুড়ি পিটাচ্ছে কিশোরের হৃৎপিণ্ড। পাগলের মত চারপাশে তাকাচ্ছে সে। পিছিয়ে যাওয়ার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে আগুনের চাদর। সামনের দরজায় লাফালাফি করছে ছোট ছোট শিখা। মড়মড় শব্দ হলো। ছাতের কড়িকাঠ ভাঙতে শুরু

করেছে।

বাড়িটাকে আগুনের পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলতে আর বেশি দেরি নেই। যে কোন মুহূর্তে তাসের ঘরের মত ধসে পড়বে। চিঁড়ে-চ্যাপ্টা করবে ওদের। তারপর পুড়িয়ে ছাই করবে।

হেনরিকে পিঠ থেকে বুকের ওপর নিয়ে এল কিশোর। সিসিকে বলল, 'শক্ত করে আমার শার্ট চেপে ধরো। ওই দরজাটা দিয়ে বেরোব।'

দুই হাতে কিশোরের শার্ট খামচে ধরল সিসি। ফোঁপানি থামাতে পারছে না কোনমতে। হেনরিকে চেপে ধরে দরজার দিকে দৌড় দিল কিশোর। কাঁধের একপাশ দিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা মারল পুড়তে থাকা কাঠে।

ছুটে গেল কব্জা।

বাইরে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে সামলে নিল। হেনরিকে ছাড়েনি। ওকে চত্বরে নামিয়ে দিয়ে ফিরে তাকাল সিসির অবস্থা দেখার জন্যে। শেষ মুহূর্তে শার্ট থেকে সিসির হাত ছুটে গেছে। বাইরে বেরিয়ে এসেছে সে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও পারল না কিশোর। বিপদ এখনও কাটেনি।

ঘোড়ার পিঠে চেপে ওদের তিনজনকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করল লোকগুলো।

'ভেতরে থাকলেই ভাল করতে!' ভয়ঙ্কর গলায় বলল মার্ক, 'তাড়াতাড়ি মরে যেতে। এখন মরবে ধীরে।'

'কাপুরুষের দল!' চিৎকার করে উঠল কিশোর। 'আমরা কোন অন্যায় করিনি। সিসি নির্দোষ!'

ঘিরে ফেলা চক্রটা ছোট করে আনতে লাগল লোকগুলো। ঘোড়ার গরম নিঃশ্বাস পড়তে লাগল কিশোরের মুখে। কাঁধে কাঁধ, গলায় গলা ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে ওগুলো। ঘামের গন্ধ পাচ্ছে কিশোর। পশুগুলোর নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ এসে লাগছে নাকে।

পালানোর পথ নেই! ঘোড়ার পায়ের ফাঁক দিয়ে দৌড়াতে গেলে মাটিতে ফেলে খুর দিয়ে মাড়িয়ে তিলে তিলে শেষ করা হবে ওদের।

খসখসে কি যেন গলায় লাগতে ফিরে তাকাল কিশোর। চামড়ার ফালির একটা ফাঁস তার গলায় নামিয়ে দিচ্ছে মার্ক ফ্রেঞ্চ।

'একটা জানোয়ারও আর অবশিষ্ট নেই তোমাদের,' বলল সে। 'এবার তোমাদের পালা। সব ক'টাকে ফাঁসিতে ঝোলাব। ইবলিসের ঝাড়-বংশ সব সাফ করে ফেলব।'

উনিশ

খেলনার দোকানটার দিকে ঘুরে তাকাল রিটা। শাটার নামানো। নীরব। অন্ধকার। রেগে যাওয়া ম্যানেজার নেই। বাচ্চা ছেলেটা নেই। কোন লোকই নেই।

অন্ধকার করিডরে চোখ বোলাল সে। রবিন কোথায়? মুসা? জিনা?

কয়েক মিনিট পরেই জানতে পারল, তার আশঙ্কাই ঠিক। বেরোতে পারেনি ওরা। সামনের অন্ধকারে, খাবারের দোকানটাতে হুটোপুটির শব্দ। বোধহয় লড়াই করছে।

দৌড় দিল রিটা। সামনের একটা ফোয়ারা থেকে পানি ভর্তি করে নিল সোকার গানটার ম্যাগাজিনে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করল, কাজ শেষ হয়ে গেলেই যাদের জিনিস আবার তাদের ফিরিয়ে দিয়ে আসবে। জিনিস দিতে না পারলে, দামটা দিয়ে আসবে।

হঠাৎ থরথর করে কাঁপতে শুরু করল পুরো মল। ভূমিকম্প শুরু হলো নাকি? না, ভূমিকম্প নয়, বড় কোন জেট প্লেন যাচ্ছে। তারপর মনে হলো, উঁহু, জেট প্লেনও নয়। অন্য কিছু।

কি শুরু হলো এই মলে!

থামল না সে। খাবারের দোকানের কাছে এসে দেখল চেয়ার-টেবিল সব উল্টে পড়ে ছত্রখান হয়ে আছে। কোন্‌দিকে তাড়া করে নিয়ে যাওয়া হয়েছে রবিনদের, বোঝা যায়।

না, বেরোতে ওরা পারেনি। শেষ মাথায় নিয়ে গিয়ে কোণঠাসা করে ফেলেছে গার্ডেরা। পেছন দিকে হাত মুচড়ে ধরে দেয়ালের গায়ে চেপে ধরেছে মুসা, রবিন আর জিনাকে। নড়তেও কষ্ট হচ্ছে ওদের। লড়াই শেষ। সবার মুখ ওপর দিকে।

কি দেখছে ওরা?

রিটাও স্কাইলাইটের দিকে মুখ তুলে তাকাল।

হাঁ হয়ে গেল মুখ।

একটা ইউ এফ ও। ফুড কোর্টের ওপর নেমে আসছে।

ভয়ানক শব্দে ভেঙে পড়ল স্কাইলাইটের কাঁচ। ধীরে ধীরে নামতে শুরু করল যানটা। বিল্ডিঙের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ওটার ভীষণ শক্তিশালী জেট ইঞ্জিন থেকে বেরোনো বাষ্প আর আগুনের হলকায় পুড়ে, গলে পানি হয়ে যেতে লাগল প্লাস্টিক। আগুন ধরে গেল চায়না-বান স্ট্যান্ডটায়। বৃষ্টির মত চতুর্দিকে ছিটকে পড়তে লাগল কাঁচ, ধাতু আর কাঠের টুকরো। ভয়াবহ গরম হলকা এসে লাগল রিটার মুখে। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছে না। সত্যি সত্যি একটা ইউ এফ ও নেমে এসেছে মলের ভেতরে।

ছয়টা ধাতব পা বেরিয়ে এল ওটার পেটের নিচ থেকে। পোড়া মেঝেতে ছড়িয়ে বসল। খুলে গেল হ্যাচওয়ে। তীব্র সাদা আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। প্রায় নিঃশব্দে নেমে এল মইয়ের মত ধাতব সিঁড়ি।

ইউ এফ ও থেকে নামল একজন ভিনগ্রহবাসী। অবিকল

মানুষের মতই দেখতে। তবে খুব লম্বা। চোখ দুটো কেবল অস্বাভাবিক। লাল অঙারের মত জ্বলছে ধক্‌ধক্‌ করে। রূপালী রঙের পোশাক পরনে। হাতে ছোট একটা জিনিস। কোন ধরনের অস্ত্র।

কথা বলে উঠল লোকটা। ভারী কণ্ঠস্বর। একেবারে যান্ত্রিক। সিনেমার রোবটেরা ওরকম করে কথা বলে। মুসা, রবিন আর জিনা ক মহাকাশযানে তোলার হুকুম দিল।

ওদেরকে কি প্রয়োজন এই ভিনগ্রবাসীগুলোর? কি করবে নিয়ে গিয়ে?

প্রায় কোন রকম বাধাই দিতে পারল না তিন গোয়েন্দা। মহাকাশযানে তোলা হলো ওঁদের।

অন্ধকার ছায়ার দিকে তাকিয়ে বলল নেতা গোছের লোকটা, 'রিটা গোল্ডবার্গ, বেরিয়ে এসো। নইলে তোমার বন্ধুদের খুন করা হবে।'

মোটা থামের আড়ালে লুকিয়ে পড়েছে রিটা। ওখান থেকেই জবাব দিল, 'কি করে বুঝব, আমি বেরোলে আমাকে সহ খুন করবেন না?'

ঝটকা দিয়ে তার দিকে ঘুরে গেল নেতার মুখ।

চট করে সরে গেল রিটা। ময়লা ফেলার একটা ধাতব ড্রামের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

'আমাদের ওপর বসের নির্দেশ আছে, তোমাদের জ্যান্ত ধরে নিয়ে যেতে হবে,' জবাব দিল নেতা, 'যদি সম্ভব হয়। বেশি জ্বালাতন করলে শেষ করে দিতে বলা হয়েছে। এখন ভেবে দেখো, কোনটা তোমার পছন্দ। লাশগুলো নিয়ে গেলেও চলবে। তিনটে তাজা লাশ পেলে কম খুশি হবেন না বস।'

ঢোক গিলল রিটা। চিন্তা করল এক মুহূর্ত। তারপর দুই হাত মাথার ওপর তুলে বেরিয়ে এল। 'এই যে, আমি এসেছি।'

'বুদ্ধিমতী মেয়ে!' একঘেয়ে কণ্ঠস্বর লোকটার। পুরোই

রোবটের মত আচরণ। 'খুব চালাক। বন্ধুদের জীবন বাঁচালে।'

লোকটার চোখে চোখে তাকাল রিটা। ওর চেয়ে অনেক লম্বা। পারবে ওর সঙ্গে?

পারতেই হবে!

চোখ বুজল রিটা। ভয় নেই মনে।

শক্তি কেন্দ্রীভূত করছে।

বেজে উঠল সাইরেন। পুলিশের গাড়ির। ময়লা ফেলার পিপাটার কাছ থেকে বেরিয়ে এসে ফুড কোর্টটাকে ঘিরে ফেলল ডজনখানেক গাড়ি। তীব্র গতিতে ছোটাছুটি শুরু করল মেঝেতে। প্রচুর বিদ্যুৎ হজম করেছে রিটা। সেই শক্তি প্রয়োগ করে চালাচ্ছে খেলনাগুলোকে।

পায়ের কাছে রকেট-গতিতে ছোটাছুটি করতে থাকা খেলনাগুলো রিটার প্রতি মনোযোগ নষ্ট করে দিল নেতার। এই সুযোগে পিপার আড়ালে চলে এল আবার রিটা। রাইফেলটা হাতে নিয়ে বেরোল।

'খবরদার!' গর্জে উঠল সে। নেতার দিকে তাক করে ধরেছে খেলনা অস্ত্র। 'নড়লেই গুলি করব!'

দ্বিধায় পড়ে গেল নেতা। অস্ত্রটার দিকে তাকিয়ে আছে। 'খেলনা। ওটা তোমাকে বাঁচাতে পারবে না।'

ট্রিগার টেনে দিল রিটা।

পিচকারির মত তীব্র গতিতে ছুটে গেল রূপালী পানির সরু একটা ধারা। ভিজিয়ে দিল নেতাকে। মুখের ভেতর থেকে থু-থু করে পানি ফেলল নেতা। 'বোকা মেয়ে! তুমি ভেবেছ সিনেমার রোবটগুলোর মত পানি দিয়ে আমাকে গলিয়ে ফেলবে!'

গা বেয়ে পানি পড়ে লোকটার পায়ের কাছে জমা হলো। পায়ের কাছ থেকে পানির একটা রেখা মেঝে বেয়ে রিটার কাছে এসে থেমেছে।

'গলাব কেন?' জবাব দিল রিটা। 'কাবাব বানাব।'

হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে। পানির রেখার মাথাটার ওপর দৃষ্টি স্থির করল। ছিটকে বেরোতে শুরু করল গোলাপী স্ফুলিঙ্গ। পানি বেয়ে ভয়ঙ্কর ভোল্টের বিদ্যুৎ তীব্র গতিতে ধেয়ে গেল লোকটার দিকে। চোখের পলকে গিলে ফেলল তাকে গোলাপী বিদ্যুতের জাল। মাটিতে পড়ে জবাই করা ছাগলের মত ছটফট শুরু করল সে। তারপর নিথর হয়ে গেল।

চেঁচামেচি শুনে বেরিয়ে এল চার গার্ড। মই বেয়ে দ্রুত নেমে এল নিচে। নেতার দেহটা দেখল।

'কে এগোবে এরপর?' হুমকি দিয়ে বলল রিটা।

এক মুহূর্ত থমকাল ওরা। তারপর এগিয়ে এসে ঘিরে ফেলার চেষ্টা করল ওকে।

ওদেরকে কাছে আসার সুযোগ দিল রিটা। হাসি হাসি কণ্ঠে বলল, 'জো-জো খেলবে?' লাফ দিয়ে তার হাতে বেরিয়ে এল একটা লম্বা ধাতব স্প্রিঙের মত খেলনা। মাথার ওপর ঘোরাতে শুরু করল। গোলাপী আলোর চক্র তৈরি করল স্প্রিংটা।

ভয়াবহ বিদ্যুতের ছোঁয়ায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ল চার ভিনগ্রহবাসী গার্ড।

একটা সেকেন্ডও আর দেরি করল না রিটা। পাঁচ-পাঁচটা দানবকে ধরাশায়ী করে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেছে তার। ওরা জ্ঞান ফিরে পাওয়ার আগেই মই বেয়ে উঠে এসে ঢুকে পড়ল ইউ এফ ও-র ভিতরে।

*

মহাকাশযানের ভেতরটা আহামরি কিছু নয়। আধুনিক যাত্রীবাহী জেট প্লেনের পাইলটের কেবিনে যে ধরনের কন্ট্রোল প্যানেল থাকে প্রায় সেই রকম। কেবল ছাতটা অন্য রকম। ঝলমলে সাদা আলোকিত গম্বুজের মত।

হ্যাচটা লাগিয়ে দিল সে। দেয়ালে সুইচ রয়েছে। নিচে লেখা: হ্যাচ। সুইচটা অফ করে দিতেই লেগে গেল হ্যাচ।

ঘুরে তাকাতেই একধারে মুসা, রবিন আর জিনাকে দেখতে পেল সে। দাঁড়িয়ে আছে ওরা। কিংবা বলা যায় দাঁড়ানো অবস্থায় আটকে রাখা হয়েছে ওদের। মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত লম্বা, পরিষ্কার হালকা হলুদ রঙের প্লাস্টিকের মোটা টিউব খাড়া করে রাখা। তাতে ভরে রাখা হয়েছে তিনজনকে। কেমন আচ্ছন্নের মত হয়ে আছে ওরা। ল্যাবরেটরিতে মৃত প্রাণীকে যেমন করে তরল ওষুধের মধ্যে ভরে রাখা হয়, অনেকটা তেমনিভাবে। তফাৎ কেবল, ওরা জ্যান্ত।

কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে তাকাল রিটা। আশ্চর্য আরেকটা ক্ষমতা অনুভব করছে নিজের মধ্যে। প্যানেলটা যেন তার বহু পরিচিত। কোন সুইচটা টিপলে কি হবে, প্রায় সবই বুঝতে পারছে।

একটা চারকোনা বোতাম টিপে দিতেই নিঃশব্দে ওপরে উঠে গেল টিউবগুলো। যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে মেঝের ওপর দিয়ে তার দিকে হেঁটে এল মুসা, রবিন আর জিনা।

'অনেক ধন্যবাদ, রিটা,' জিনা বলল। 'আমি জানতাম, তুমি আসবে।'

'ভেন্নাগুলোর কি অবস্থা?' মুসা জানতে চাইল। 'বিপদ কি কাটল আমাদের?'

'এখনও কাটেনি,' জবাব দিল রিটা।

'তুমি ঢুকলে কি করে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'লড়াই করেছি ওদের সঙ্গে। ওরা হেরেছে।'

'খাইছে!' চোখ বড় হয়ে গেল মুসার। 'একা ওই পাঁচ-পাঁচটা দৈত্যকে কাবু করে ফেললে!'

'নইলে কি আর আমাকে এখানে ঢুকতে দিত? তোমাদের মত ধরে নিয়ে আসত। এতক্ষণে আমিও বন্দি হয়ে যেতাম কোন একটা টিউবে।'

'কথা পরেও বলা যাবে,' তাগাদা দিল জিনা। 'এখান থেকে

পালানো দরকার।'

গর্তটার কাছে এসে দাঁড়াল আবার সবাই। সুইচটা অন করে দিল রিটা। সরে গেল হ্যাচের ভারী ঢাকনাটা।

নিচে দাঁড়িয়ে আছে ভয়ানক রেগে যাওয়া পাঁচজন ভিনগ্রহবাসী।

হ্যাচ লাগানোর জন্যে তাড়াতাড়ি আবার সুইচ টিপল রিটা।

'আমি তো ভেবেছিলাম শয়তানগুলোকে মেরেই ফেলেছ বুঝি,' ঢাকনাটা খাপে খাপে বসে যেতে বলল মুসা।

'তারমানে বেহুঁশ হয়ে গিয়েছিল,' রিটা বলল।

'বেশ। কোনভাবে তাহলে ওদের মনে করিয়ে দাও, শয়তানি করতে এলে আবার বেহুঁশ করা হবে।'

ধুড়ুম ধুড়ুম করে বাড়ি পড়তে শুরু করল হঠাৎ মহাকাশযানের পেটে। হাতুড়ি দিয়ে বাড়ি মারছে মনে হচ্ছে। ধাতুর পাত ভেঙে ঢোকার চেষ্টা করছে ভিনগ্রহবাসীরা। সে-রাতে গাড়ির মধ্যে বসে থাকার কথা মনে পড়ল রিটার। গুণ্ডা ছেলেগুলো এসে গাড়িটাকে এ রকম করে পিটাচ্ছিল। তবে সেবার জন্মদিনের কেক মুখে মাখিয়ে দিয়ে পালানোর সুযোগ পেয়েছিল, এবার আর তত সহজ হবে না।

'এই স্পেস শিপটা আমাদের চেয়ে অনেক বেশি ভাল চেনে ওরা,' রবিন বলল। 'আমরা কিছু না করে হাত গুটিয়ে বসে থাকলে ঠিকই ঢুকে পড়বে।'

'কি করব?' রিটার প্রশ্ন।

'এটা নিয়ে উড়ে চলে গেলেই হয়,' সহজ জবাব দিয়ে দিল মুসা।

'তা তো বটেই,' পছন্দ হলো না জিনার। 'উড়ে চলে যাক ভিনগ্রহে। শত্রুর দেশে। তারপর ফিরব কি করে?'

'যেতে পারলে ফিরতেও পারব,' কন্ট্রোল প্যানেলে বসে পড়ল মুসা। 'যা হবার হবে, সে পরে দেখা যাবে। আপাতত তো

পালাই।'

'তা বটে,' মুসার সঙ্গে একমত হলো রবিন। 'বাঁচতে হলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ফুড কোর্টটা থেকে বেরিয়ে যাওয়া দরকার। কোনমতে যদি ঢুকতে পারে ওরা, দ্বিতীয়বার আর ঠেকাতে পারব না। স্রেফ খুন করে ফেলবে।'

'বেশ,' কন্ট্রোল প্যানেলের দিকে মনোযোগ দিল মুসা, 'চালানো শুরু করলাম আমি।'

বিশ

রবিন, জিনা আর রিটা মহাকাশযানের গা ঘেঁষে দাঁড়াল। ধরার মত যে যা পেল, শক্ত করে চেপে ধরল। কন্ট্রোল প্যানেলের সামনের চেয়ারে সীট বেল্ট লাগানো আছে, সেটা পরে ফেলল মুসা।

সমানে পিটিয়ে চলেছে ভিনগ্রহবাসীরা। বিকট শব্দ। সহ্য করা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে মহাকাশযানের ভেতরেই তৈরি হচ্ছে শব্দটা। সময় বেশি নেই, বুঝতে পারছে গোয়েন্দারা। শীঘ্রি মারাত্মক জখম করে ফেলবে মহাকাশযানের শরীরে, হয়তো আর মাটি ছেড়ে যাওয়াই সম্ভব হবে না তখন। ওড়ার সময় যে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি হবে, দুর্বল জায়গা থাকলে ধ্বংস হয়ে যাবে মহাকাশযান।

'সবাই রেডি?' ভয়ানক শব্দকে ছাপিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞেস করল মুসা। 'রওনা হলাম!'

কন্ট্রোলে হাত রাখল সে। কীবোর্ড নেই, স্টিয়ারিং হুইল নেই, শুধু দুটো ধাতব হাতের মত জিনিস। হাতের ছাপ নকল করে

বানানো হয়েছে যেন। ওগুলোর ওপর হাত দুটো রাখল মুসা। বসে গেল সুন্দরমত। সঙ্গে সঙ্গে মনিটরে ফুটে উঠতে লাগল নানা রকম নম্বর আর লেখা।

আরও বেড়েছে বাড়ি মারার শব্দ। মরিয়া হয়ে উঠেছে ভিনগ্রহবাসীরা।

'রেডি তো?' জিজ্ঞেস করল মুসা। কাঁধের ওপর দিয়ে ফিরে তাকিয়ে তিনজনকেই দেখল একনজর। আবার ফিরল কন্ট্রোলের দিকে। ভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সাহস জোগানোর চেষ্টা করছে নিজেকে। একটা অচেনা যানকে চালাতে ভয় যে পাচ্ছে বোঝাই যাচ্ছে। চিকন ঘাম দেখা দিয়েছে কপালে। চোখের দৃষ্টি মনিটরের ওপর স্থির। হাতের আঙুলগুলো অস্থির ভঙ্গিতে ওঠানামা করছে।

মহাকাশযানের গভীর থেকে চাপা গুমগুম শব্দ শোনা গেল। ক্রমেই বাড়তে থাকল শব্দটা। ভারী হচ্ছে। জোরাল হচ্ছে গুঞ্জন। বাইরের হাতুড়ি পেটানো থেমে গেল আচমকা। রাগে চিৎকার শুরু করেছে ভিনগ্রহবাসীরা। গোয়েন্দারা কি করতে যাচ্ছে, বুঝে গেছে।

গুঞ্জনটা তীক্ষ্ণ হতে হতে যেন আর্তনাদে রূপ নিল। দুলে উঠল মহাকাশযান। পরক্ষণে ঝাঁকি দিয়ে তীরবেগে ওপরে উঠতে শুরু করল।

কোন কিছু ধরেই দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব হলো না তিনজনের পক্ষে। প্রচণ্ড গতিবেগের কারণে পড়ে গেল মেঝেতে। সেঁটে গেল যেন মেঝের সঙ্গে। নিজের ওজন দুই টন মনে হতে থাকল রিটার।

মাথার ওপরে গম্বুজের মত ছাতটা স্বচ্ছ হয়ে গেছে। কাঁচের বড় গামলার ভেতর দিয়ে তাকালে যেমন লাগে, তেমন লাগছে রাতের আকাশটাকে। বিমূঢ় হয়ে তাকিয়ে আছে রবিন, জিনা আর রিটা। কন্ট্রোল প্যানেলে ব্যস্ত থাকায় মুসা তাকাতে পারছে না। মলের ধ্বংস হয়ে যাওয়া ছাতের গর্ত দিয়ে তীব্রগতিতে বেরিয়ে

এল মহাকাশযান। সোজা উঠে গেল মেঘের দিকে। জেট ইঞ্জিন থেকে বেরোনো উজ্জ্বল রঙিন ধোঁয়া প্রতিফলিত হয়ে মেঘটাকেও রঙিন করে দিল। জলযান চলার সময় যেমন পেছনে দীর্ঘ একটা ঢেউয়ের রেখা সৃষ্টি করে রেখে যায়, তেমনি করে মহাকাশযানটা রেখে যাচ্ছে ধোঁয়ার লেজ। উজ্জ্বল লেজটা মুছে না যাওয়া পর্যন্ত রঙিন হয়ে থাকছে মেঘ, অনেকটা ধূমকেতুর পুচ্ছের মত।

মেঘ থেকে বেরিয়ে এল মহাকাশযান। আরও ওপরে উঠল। আকাশটা এখন শুধুই কালো। গম্বুজের ভেতর দিয়ে তারাগুলোকে বড় বড় লাগছে, তবে কিছুটা ঘোলাটে।

রবিন ভাবছে, পৃথিবীর সীমানা কি ছাড়িয়ে এল? মহাকাশটাকে দেখতে কি এমনই লাগে? বিমান থেকে যে রকম দেখা যায়, তার সঙ্গে এখনকার আকাশের তেমন কোন তফাৎ খুঁজে পেল না সে। হতে পারে পৃথিবীর সীমানা এখনও কাটায়ইনি মহাকাশযান।

কখন কাটাবে? চলছে যে তাতে কোন সন্দেহই নেই।

ওপরে ওঠার সময় নিচের দিকে যেভাবে টানছিল মাধ্যাকর্ষণ, যে কারণে মেঝেতে পড়ে গিয়েছিল ওরা, সেই টানটা আর এখন নেই। উঠে দাঁড়াল রবিন। দেখাদেখি জিনা আর রিটাও উঠল।

মুসার কাছে এসে দাঁড়াল রবিন। 'চালাতে তাহলে পারছ।'

রিটা আর জিনাও এগিয়ে এল। ঘিরে দাঁড়াল মুসাকে।

'চালানো-টালানোর ব্যাপারে তুমি তো একটা জিনিয়াস,' প্রশংসা করল রিটা। 'প্লেন চালাতে পারো জানতাম। কিন্তু ভাবতেই পারিনি স্পেস শিপও চালাতে পারবে। কি করে বুঝলে?'

'খুব সহজ,' হাসতে হাসতে জবাব দিল মুসা। কেবিনের আলোয় ঝকঝক করতে থাকল তার সাদা দাঁত। 'রহস্যটা ফাঁস করে দিলেই বুঝবে, একটা বাচ্চা ছেলেও চালাতে পারবে এটা। আমি শুধু "অটো পাইলট" চালু করে দিয়েছি।'

'তারমানে নিজে নিজে চলছে এখন এটা?' ভুরু কুঁচকে ফেলল

জিনা। 'কোর্স যেখানে সেট করে রাখা আছে সেখানেই গিয়ে নামবে?'

মাথা ঝাঁকাল মুসা। 'তাই তো করার কথা। পৃথিবীতে মানুষের তৈরি প্লেন, জাহাজ তা-ই করে।'

'কাজটা কি ঠিক হবে?' রিটার প্রশ্ন।

'না হওয়ারই বা কি হলো?' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে জবাব দিল মুসা। 'প্রাণে তো বাঁচলাম।'

'কই আর বাঁচলাম,' রবিন বলল। 'মলের লোকগুলোর হাত থেকে বেঁচেছি। কিন্তু গিয়ে তো নামতে হবে ওদেরই দেশে। অর্থাৎ, শত্রুর দেশে। কোন গ্রহে যাচ্ছি, ওখানকার কোন কিছুই না জেনে হুট করে চলে যাওয়াটা কি ঠিক হবে?'

'তা তো হবেই না,' হাসিটা মুছে গেল মুসার। 'কিন্তু আর কি করতে পারি!'

'কিছু একটা উপায় বের করা দরকার, বেশি দেরি হয়ে যাবার আগেই,' চিন্তিত স্বরে বলল রবিন।

'করো, করো, যা করার জলদি করো। ভাবাভাবিগুলো আমার কর্ম নয়। আমাকে যে ভাবে চালাতে বলবে, আমি সেভাবেই চালাব।'

'তারচেয়ে এক কাজ করি বরং,' রিটা বলল। 'যে ভাবে চলছে এটা চলতে থাকুক। দেখি না কোনখানে গিয়ে থামে। জায়গাটা দেখে নেয়া দরকার। তারপর আবার অটো পাইলট চালু করে সহজেই পৃথিবীতে ফিরে আসা যাবে।'

'তা ঠিক,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'বুদ্ধিটা মন্দ না।'

'হ্যাঁ, সুযোগ যখন একটা পাওয়াই গেল,' জিনার কণ্ঠেও উত্তেজনা, 'গ্রহটা দেখে এলে মন্দ কি?'

সীটে হেলান দিল মুসা, 'আমি রাজি।'

একুশ

কিশোরের গলা থেকে ফাঁসটা খুলে নিল মার্ক। খিকখিক করে হাসল। 'না, অত সহজে মারব না। এত তাড়াতাড়ি মেরে ফেললে মজাটা আর রইল কোথায়...'

হঠাৎ চালার একটা জ্বলন্ত অংশ খসে পড়ল মাটিতে।

ঘাবড়ে গিয়ে পেছনের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে গেল ঘোড়াগুলো। চোখ উল্টে দিয়েছে। ওগুলোর কালো চোখে আতঙ্ক।

হেনরির হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে সরিয়ে নিল কিশোর।

ঘোড়াগুলোকে সামলাতে পারল না সওয়ারিরা। ভয়ে চিৎকার করতে করতে অন্ধকারে ছোটাছুটি শুরু করল ওদের বাহনগুলো। জিন আঁকড়ে বসে রইল কেউ, কেউ বা ঝুলে রইল একপাশে। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে অস্থির।

মাটিতে পড়তে পড়তে জিনে আটকে গেল জন ফ্রেঞ্চের ভাঙা হাতের স্লিং। পা পড়ে গেছে মাটিতে। হিঁচড়ে নিয়ে তাকে দৌড় দিল ঘোড়াটা। এতদিকে পথ খোলা থাকতে ওটা ছুটল জ্বলন্ত বাড়িটার দিকে। একই রকম অদ্ভুত কাণ্ড করল মার্কের ঘোড়াটাও। সওয়ারি নিয়ে সোজা জ্বলন্ত বাড়ির দিকে দৌড়। ঠিক এই সময় চালার আরও একটা বিরাট অংশ ভেঙে পড়ল ওদের ওপর। আগুন গ্রাস করে নিল ওদের। মাথা ঝাড়া দিতে দিতে একটা ঘোড়াকে কোনমতে আগুনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখল কিশোর। কেশরে আগুন ধরে গেছে। মার্ক ফ্রেঞ্চ নেই তার পিঠে।

এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে দু'চারজন সাহসী যা ছিল দলে, তারাও আর দেরি করল না। হয় ঘোড়ার পিঠে বসে, নয়তো লাফ দিয়ে মাটিতে পড়ে দৌড়ে পালাতে লাগল দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে।

চোখের পলকে খালি হয়ে গেল জায়গাটা। আগুনের হলুদ আলোয় আলোকিত।

'গর্দভের দল!' বিড়বিড় করে বলল সিসি। 'ঘোড়া যে আগুনকে ভয় পায়, ভুলেই গিয়েছিল ওরা!'

'হ্যাঁ,' বিমূঢ় ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কিশোর, 'আগুনের এত কাছে আসা উচিত হয়নি ওদের।'

জ্বলন্ত বাড়িটার দিকে চোখ তুলে তাকাল সে। জন বা মার্ক বেরিয়ে আসছে কিনা দেখছে। ওদের ঘোড়া দুটো পালিয়েছে। একটার পিঠেও সওয়ারি ছিল না। চালার নিচে চাপা পড়েছে দুই ভাই। জ্ঞান হারিয়ে থাকলে সব সাহায্যের বাইরে চলে গেছে ওরা এতক্ষণে। গায়ে কাঁটা দিল তার। সিসি আর হেনরির কাঁধে দুই হাত রেখে যেন সাহস সঞ্চয় করতে চাইল।

আগুনের লেলিহান শিখা ক্রমেই উঠে যাচ্ছে ওপরে। লোভী দানবের মত পুরো বাড়িটাকে গিলে নিয়েছে।

'পালানো দরকার!' সংবিৎ ফিরে পেল যেন কিশোর হঠাৎ। 'লোকগুলো শীঘ্রি ফিরে আসবে, মার্ক আর জনের কি হয়েছে দেখতে। দুই ভাই বেঁচে থাকলেও আমাদের ছাড়বে না, আর মরে গেলে তো খেপা কুকুর হয়ে যাবে ওদের পরিবারের লোকজন।'

কিন্তু ছেলেমেয়ে দুটোকে নিয়ে কোথায় যাবে সে? এই এলাকায় কে সাহায্য করবে তাকে? খাবার নেই। পকেটে একটা পয়সা নেই। রাইফেলটাও গেছে ঘরের সঙ্গে সঙ্গে।

'কোথায় যাব?' মৃদু স্বরে জানতে চাইল সিসি।

বড় করে দম নিল কিশোর। 'বনের মধ্যে কাটিয়ে দেব আজকের রাতটা। কাল একটা বুদ্ধি বের করব।'

তার প্যান্ট খামচে ধরল হেনরি। চোখ নামাল কিশোর।

হেনরির ছোট্ট তুলতুলে গালে ছাই আর কালি লেগে আছে। সবুজ চোখ দুটো অনেক বড় লাগছে এখন, টলটলে, যেন গভীর দীঘির পানি। ঝুলে পড়েছে ছোট ছোট কাঁধ।

'এখানে থাকব না আমরা,' ভীষণ ক্লান্ত লাগছে কিশোরের, কিন্তু তবু দুই হাত বাড়িয়ে কোলে তুলে নিল হেনরিকে। 'থাকলে মরতে হবে।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে বনের দিকে হাঁটতে শুরু করল সে। 'সিসি, আমার শার্ট ধরে রাখো। কোন কারণেই আলাদা হবে না।'

বনের মধ্যে ঢুকে পড়ল ওরা। চাঁদের আলোকে আড়াল করে রেখেছে গাছপালার ঘন ডাল-পাতা।

পেছন থেকে শার্ট ধরে হাঁটতে গিয়ে বার বার কিশোরের পায়ে হোঁচট খাচ্ছে সিসি, গায়ের ওপর এসে পড়ছে। কাঁধে বসা হেনরি দুই পা দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছে গলা। এ অবস্থায় হাঁটা খুব কঠিন হয়ে উঠেছে কিশোরের জন্যে।

আরেক বার হোঁচট খেয়ে সিসি বলল, 'সরি, কিশোরভাই, দেখতে পাচ্ছি না।'

'হয়েছে,' জবাব দিল কিশোর, 'হাঁটার গতি এবার কমানো যায়।'

'বনের মধ্যে এত অন্ধকার, বাপরে!' গলা কেঁপে উঠল সিসির।

গাছের ডাল থেকে শূন্যে ঝাঁপ দিল একটা পেঁচা। মুহূর্ত পরেই আক্রান্ত ইঁদুরের তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার শোনা গেল। শিকার নিয়ে অন্য ডালে গিয়ে বসল আবার পেঁচাটা।

এরপর ভারী নীরবতা।

অন্ধকারে চোখ মেলে দেখার চেষ্টা করছে কিশোর। তার মনে হচ্ছে বনের সব হিংস্র জানোয়ারের চোখ এখন ওদের দিকে। যে কোন মুহূর্তে ইঁদুরটার যা গতিক হয়েছে, ওদেরও তা-ই হবে।

হেনরিকে এক কাঁধের ওপর বসাল সে। আগে বাড়তে গিয়ে

পায়ের নিচে মট করে ভাঙল শুকনো ডাল।

সড়সড় করে দৌড়ে চলে গেল কি যেন। আরেকটা ইঁদুর হবে, ভাবল সে। কিংবা অন্য কোন ছোট প্রাণী। কাঠবিড়ালীও হতে পারে। নিরীহ–নিজেকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করল। ক্ষতি করবে না।

'হাঁটতে থাকো,' সিসিকে বলল সে।

বনের মধ্যে বাতাস ঠাণ্ডা। ভেজা ভেজা। যতই গভীরে ঢুকছে ঠাণ্ডা বাড়ছে। গাছের ডাল-পাতা এড়িয়ে চলার উপায় নেই। গায়ের সঙ্গে বাড়ি খাচ্ছে। পায়ের নিচে ঝরা পাতার পুরু কার্পেট।

কানের কাছে হেনরির নিঃশ্বাস আর সিসির হাঁপানোর শব্দ ছাড়াও আরেকটা শব্দ কানে এল কিশোরের।

দাঁড়িয়ে গেল।

'কি হলো?' জানতে চাইল সিসি।

'চুপ!' চাপা গলায় বলল সে। 'শব্দ!'

'কিসের? কিসের শব্দ?'

'কথা বোলো না। দম বন্ধ করে রাখো। হেনরি, তুমিও।'

কান পেতে রইল কিশোর। কিছু শুনল না। অবশেষে ছেড়ে দিল দমটা।

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলতে শুনল সিসিকে।

আবার হাঁটতে লাগল ওরা। কিছুদূর এগিয়ে কিশোর বলল, 'সামনে মনে হচ্ছে থামার জায়গা পাব।'

ছোট একটা জায়গায় গাছপালা সামান্য পাতলা। চাঁদের আলো এসে পড়ছে মাটিতে। বেশি না, তবে দেখার জন্যে যথেষ্ট। বড় একটা গাছ কাত হয়ে পড়ে থাকতে দেখা গেল। মস্ত খোঁড়ল।

'ওতে ঢুকে লুকিয়ে থাকা যাবে,' খোঁড়লটা দেখিয়ে বলল কিশোর। হেনরিকে নামিয়ে দিল কাঁধ থেকে।

হামাগুড়ি দিয়ে তাতে ঢুকে গেল হেনরি।

তারপর ঢুকল সিসি। 'উঁহু, ভয়ানক গন্ধ!'

'ও কিছু না। পচা কাঠের গন্ধ,' অধৈর্য কণ্ঠে বলল কিশোর। 'গন্ধ তোমার কোন ক্ষতি করবে না।'

সে নিজেও ঢুকে পড়ল খোঁড়লে। পা লম্বা করা যাচ্ছে না। মুড়ে নিয়ে এল বুকের কাছে। সারা শরীরে অকল্পনীয় ব্যথা।

ফার্মে আর ফিরে যেতে পারবে না। রাতটা কোনমতে নিরাপদে কাটাতে পারলে আগামীকাল ভেবে দেখবে কি করা যায়।

পাতায় পাতায় কাঁপন তুলে বয়ে গেল এক ঝলক বাতাস। কি যেন গোপন কথা বলে গেল পরস্পরকে ফিসফিস কানাকানি করে। ডালে ডালে ঘষা খেয়ে বিচিত্র শব্দ সৃষ্টি করল।

জেগে বসে পাহারা দেয়া দরকার। কিন্তু কোনমতেই চোখ খোলা রাখতে পারছে না আর। দশ মণ ভারী হয়ে আসছে যেন চোখের পাতা।

আরেকটু আরাম করে বসার জন্যে নড়েচড়ে সোজা করল মাথাটা, নজর পড়ল সামনে গাছের বেড়ার মাঝে অন্ধকার ছায়ার দিকে।

জ্বলন্ত দুটো হলুদ চোখ সরাসরি তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বাইশ

আতঙ্কিত চিৎকারটা মুখ থেকে বেরোতে দিল না কিশোর। ঢোক গিলে নামিয়ে দিল বহু কষ্টে।

কিসের চোখ? নেকড়ে? ভালুক? পাহাড়ী সিংহ? ভয়ঙ্কর সব হিংস্র জন্তুর চেহারা খেলে যেতে লাগল মনের পর্দায়। সঙ্গে বন্দুক

নেই। আত্মরক্ষার উপায় নেই।

আমাকে দেখেনি! নাকি দেখেছে? ভাবনাগুলো এলোমেলো আঘাত হানতে লাগল যেন মগজের মধ্যে। আমরা যে আছি খোঁড়লের মধ্যে, সেটাই জানে না!

বুকের মধ্যে ধুড়ুস ধুড়ুস করছে হৃৎপিণ্ডটা। গলা শুকিয়ে কাঠ। পিছিয়ে আসতে গেল।

'আউ!' চিৎকার করে উঠল সিসি। 'কি করছ?'

'চুপ!' নিচু স্বরে সাবধান করল কিশোর। 'বললাম না তখন, একটা শব্দ শুনেছি!...পিছে পিছে চলে এসেছে ওটা। আমাদের খুঁজছে এখন।'

'কোথায়?' এগোতে গিয়ে জায়গা না পেয়ে কিশোরের পায়ের ওপর চেপে বসল সিসি।

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে রইল সে। তারপর বেরিয়ে যেতে শুরু করল।

ধরার জন্যে থাবা মারল কিশোর। স্কার্ট চেপে ধরতে গেল। আঙুলের ফাঁক দিয়ে পিছলে গেল কাপড়। ধরে রাখতে পারল না। বেরিয়ে গেছে সিসি।

'সিসি! জলদি ভেতরে ঢোকো!'

ইঁদুরটার আর্তচিৎকারের কথা মনে পড়ল কিশোরের। সিসিকে কি করবে এই প্রাণীটা?

সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল কিশোর। সিসির কোন ক্ষতি করতে দেবে না।

হামাগুড়ি দিয়ে খোঁড়লের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ল সে। কয়েক ফুট দূরে দেখা গেল সিসিকে। ঘন ডালপাতা ভেদ করে চাঁদের আলোর আবছা আভা এসে অদ্ভুত আলো-আঁধারি সৃষ্টি করেছে তাকে ঘিরে।

ছায়া থেকে বেরিয়ে এল জ্বলন্ত চোখজোড়া।

চাপা গর্জন করে উঠল। ভারী গর্জন।

নেকড়ে!

সাপের মত নিঃশব্দে অন্ধকার থেকে আলোয় বেরিয়ে এল ওটা। কাঁপতে লাগল কিশোর। লম্বা, শক্তিশালী দেহটা এগিয়ে আসছে সিসির দিকে।

অত বড় জানোয়ারের সঙ্গে লড়াই করে পারবে না। দৌড় দিয়েও লাভ নেই।

নেকড়ের মুখটা স্পষ্ট হতেই হাঁ হয়ে গেল কিশোর। একটা মরা খরগোশ দাঁতে ঝুলছে।

ধীরে ধীরে সিসির দিকে এগোচ্ছে সাদা প্রাণীটা। চাঁদের আলোয় রূপালী লাগছে। সিসির কাছে এসে মাথা নিচু করল। খরগোশটা সিসির পায়ের কাছে ফেলে দিয়ে নিজেও শুয়ে পড়ল মাটিতে।

পালাও, সিসি! দৌড় দাও! চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল কিশোরের। নেকড়ের ভয়ে বলতে পারল না। সিসিকে নেকড়েটার পাশে শুয়ে পড়তে দেখে দম আটকে এল তার। চিৎকারটা ঠেলে উঠে আসতে চাইছে গলার কাছে, বহু কষ্টে নিচে নামাল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত তাকিয়ে দেখছে, আস্তে করে একটা হাত রাখল সিসি নেকড়েটার ঘাড়ে। ধীরে ধীরে নিজের মুখটা নিয়ে গেল সেদিকে। ওটার রোমশ চামড়ায় গাল রাখল সে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর।

সিসির সেই নেকড়েটা!

গাঁয়ের লোকে কি তাহলে ঠিকই বলে? জন্তু-জানোয়ারকে বশ করার অশুভ ক্ষমতা আছে সিসির? উঁহু! মেনে নিতে পারল না সে। যেটা আছে, সেটা ভাল ক্ষমতা। জানোয়ারের বিশ্বাস অর্জন করে নিতে পারে। ওদের ভালবাসে, বোঝাতে পারে। যে ক্ষমতা ছিল লং জন হার্টের। তাতে অশুভ কোন ব্যাপার নেই।

খসখস শব্দ শুনে ফিরে তাকাল কিশোর। হেনরিও বেরিয়ে এসেছে। সিসি আর নেকড়েটার দিকে তাকিয়ে বড় বড় হয়ে গেছে

চোখ।

'ভয় নেই, হেনরি,' কানের কাছে মুখ নিয়ে মৃদুস্বরে বলল কিশোর। 'এটা সিসির সেই বন্ধু নেকড়েটা। খরগোশ শিকার করে এনে দিয়েছে খাওয়ার জন্যে।'

নেকড়েটার দিকে চুপ করে তাকিয়ে আছে হেনরি।

এখনও তার ভয় যাচ্ছে না ভেবে কিশোর বলল, 'নেকড়েটা কোনভাবে বুঝতে পেরেছে বিপদে পড়েছে তার বন্ধু। বাড়িতে সেদিন মাংস খাওয়াতে দেখে পরে আমি সিসিকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বনের মধ্যে বাচ্চা অবস্থায় নাকি ওটাকে দেখতে পেয়েছিল সিসি। ওটার মা মরে গিয়েছিল। খাবার দিয়ে, আরও নানা ভাবে সাহায্য করে বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল সিসি। বড় হয়ে বিপদের দিনে এখন বন্ধুকে সাহায্য করে প্রতিদান দিতে এসেছে নেকড়েটা।'

মাথা ঝাঁকাল হেনরি। ক্লান্ত চোখের পাতা ডলল। তাকে আবার খোঁড়লের মধ্যে নিয়ে গেল কিশোর। তার কোলের মধ্যে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল হেনরি।

সিসির দিকে তাকাল কিশোর। নেকড়ের কোলের কাছে কুঁকড়ে শুয়ে, গায়ে মাথা রেখে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েছে সিসি।

খোঁড়লের দেয়ালে মাথা ঠেস দিয়ে কিশোরও ঘুমিয়ে পড়ল।

তেইশ

ঘুম ভেঙে গেল কিশোরের। কেন ভাঙল? বুঝতে পারল না।

দম বন্ধ করে, কান পেতে রইল।

বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকাল। নেকড়েটা চলে গেছে। খোঁড়লের মধ্যে কিশোরের পাশে এখন শুয়ে আছে সিসি। গভীর ঘুমে অচেতন।

নড়েচড়ে আরাম করে বসল কিশোর। চোখ বুজল। কিন্তু আর আসছে না ঘুম।

হাজারটা ভাবনা ভীড় করে এল মনে। কি করবে সকাল হলে? এই খোঁড়লে অনন্তকাল ধরে বসে থাকা যাবে না। আলো ফুটলে ফ্রেঞ্চরা দলবল নিয়ে ছুটে আসবে। পকেটে একটা পয়সা নেই। খাবার নেই। পরনের কাপড়ের হালও বড় করুণ। কি করে বাঁচাবে হেনরি আর সিসিকে?

কান পেতে শুনছে বাতাসে গাছের পাতার ফিসফিসানি। ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে চলেছে যেন। কিন্তু ঘুম আর তার কোনমতেই এল না। ভেবেই চলেছে। রহস্যময় কতগুলো প্রশ্নের জবাব খুঁজে পাচ্ছে না সে। মেলাতে পারছে না। এই যেমন, নেকড়ের কথাই ধরা যাক। এতদিন জেনে এসেছে, আন্ডিজ পর্বতমালায় নেকড়ে নেই। তাহলে এ বনেরগুলো এল কোথা থেকে? গাঁয়ের লোকে বলে, সিসির অশুভ ক্ষমতা আছে। জন আর মার্ক ফ্রেঞ্চের ঘোড়াগুলোকে খেপিয়ে তুলেছিল সে। ওদের কথা ঠিক নয়–সিসি কিছু করেনি, কিশোর অন্তত বিশ্বাস করে না: কিন্তু তাহলে ওভাবে খেপল কেন ঘোড়াগুলো? অস্বাভাবিক ঘটনা। তারপর আজকে, দুই ভাইয়ের ঘোড়া দুটো প্রাণের মায়া না করে যে ভাবে ছুটে গেল আগুনের মধ্যে, তাতে যে কেউ বলবে উস্কানি দিয়ে ওগুলোকে সেদিকে যেতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। তারপর রয়েছে লং জন হার্ট আর তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুটা। গাড়ির ঘোড়াগুলো সেদিনও যেন অদৃশ্য কারও নির্দেশে সোজা খাদের দিকে ধেয়ে গিয়েছিল, নিজেদের প্রাণের পরোয়া না করে। তিনটে ব্যাপারকে এক করে দেখলে একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায়–মোটেও স্বাভাবিক নয় ঘটনাগুলো; এ সবের পেছনে কারও কোন হাত নেই. এটা

বললেই বরং মেনে নিতে ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া সিসি আর হেনরির মা-বাবা···

'কিশোরভাই, তুমি ঘুমাচ্ছ না?' সিসির কথায় বাস্তবে ফিরে এল কিশোর।

'তুমিও তো ঘুমাচ্ছ না।'

'ভেঙে গেল ঘুমটা। এভাবে কি ঘুমানো যায়?'

'বাইরেই তো ভাল ছিলে। নেকড়ে-বন্ধুর সঙ্গে। খোঁড়লে ঢুকলে কেন?'

'ও চলে গেল। ডাকলেই আবার আসবে।' এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সিসি বলল, 'কিশোরভাই, কাল আমরা কোথায় যাব? ভেবেছ কিছু?'

'কি আর ভাবব, বলো? কাফেলায় ঢুকে পড়াই উচিত।'

'ওই এতিমদের মিছিলে! ফকিরের মত ভিক্ষে করতে করতে যাব?' রাগত স্বরে বলল সিসি, 'কিশোরভাই, তুমি বলেছিলে আমাদেরকে এতিমের মিছিলে ঢোকাবে না।'

'বোঝার চেষ্টা করো, সিসি, আর কোন উপায় নেই এখন আমাদের,' বিষণ্ন কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'ফার্মে ফিরে যেতে পারছি না। কাল রাতে যা ঘটে গেছে, এর পর গাঁয়ের পথে আমাদের দেখামাত্র ধরে নিয়ে গিয়ে হয় পুড়িয়ে মারবে, নয়তো ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেবে লোকে। কেউ কোন কথা শুনবে না। তা ছাড়া ফিরে যাবই বা কোথায়? বাড়িঘর কি আর আছে? সব তো পোড়া ছাই। তারচেয়ে এই জঘন্য জায়গা থেকে বেরিয়ে চলে যাব আমরা।'

'কোথায় যাব?' সিসির প্রশ্ন।

' উত্তর আমেরিকায়। সেখানে আমাদের বাড়ি আছে, আমার চাচা আছে, চাচী আছে; কোন অসুবিধে হবে না তোমাদের। সুখেই থাকতে পারবে।'

'আমি তো জানতাম দক্ষিণ আমেরিকারই অন্য এক শহর

থেকে এসেছ তুমি। তাই তো বলেছিলে।'

'মিথ্যে বলেছিলাম। কারণ আমি এখনও জানি না, এখানে কিভাবে এসেছি। আর আমার যেটা সন্দেহ, সেটা আমি নিজেই বিশ্বাস করতে পারছি না। তোমাদের আর কি বলব!'

দীর্ঘ একটা মুহূর্ত চুপ করে রইল সিসি। 'কিন্তু আমি কারও গলগ্রহ হতে চাই না,' দৃঢ়কণ্ঠে বলল সে। 'আমি বড় হয়ে গেছি। নিজের দেখাশোনা নিজেই করতে পারব।'

কথার শব্দে হেনরির ঘুমও ভেঙে গেছে। ঠোঁটে ঠোঁট চেপে বসেছে তার। চোয়াল শক্ত হয়ে গেছে। বোনের কথা সমর্থন করেই যেন সে-ও জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল ওপরে-নিচে।

'পারবে না, তা তো বলছি না। কিন্তু পারার জন্যে একটা স্বাভাবিক পরিবেশ চাই। সেটা কোথায় এখানে? থাকা তো দূরের কথা, গাঁয়ের লোকের চোখে পড়লেও মরতে হবে।'

'কোনভাবে ওদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে থাকতে যদি পারতাম, ভাল হত!' সিসি যেতে চায় না কেন, বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না কিশোরের। নিজের জন্মভূমি, এতকালের বাসস্থান ফেলে কে-ই বা যেতে চায়!

বোনকে সমর্থন করে আবার জোরে জোরে মাথা ঝাঁকাল হেনরি।

'লং হার্টকে আমি কথা দিয়েছিলাম,' কিশোর বলল, 'আমি তোমাদের ফেলে যাব না। তোমাদের দেখব।'

'কিন্তু সেই কথা আর রাখতে পারছ না,' কেঁপে উঠল সিসির গলা।

'পারলাম না কোথায়? আমি তো তোমাদের ফেলে যাচ্ছি না। সঙ্গেই যাচ্ছি। বরং নিয়ে যাচ্ছি এমন একখানে, যেটা এখানকার চেয়ে হাজারগুণ ভাল।'

জোরে জোরে মাথা নেড়ে বুঝিয়ে দিল হেনরি, সে যেতে চায় না, হাজারগুণ ভাল হলেও না। সে এখানেই থাকতে চায়।

তাকে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে কিশোর বলল, 'ভাবনা নেই, হেনরি, আবার আসব আমরা এখানে। তবে অসহায় হয়ে নয়, শক্তি সঞ্চয় করে, টাকা-পয়সা নিয়ে, যাতে সমানে সমানে বাধা দিতে পারি ফ্রেঞ্চদের। শয়তান গ্যারিবাল্ড আর টাকার জন্যে মোচড় দিয়ে আমাদের দুর্বল করে ফেলতে না পারে...'

কথা শেষ হলো না তার। কানে এল ইঞ্জিনের শব্দ। অবাক হয়ে কান পাতল। খানিক পরে উজ্জ্বল আলো দেখতে পেল গাছপালার ফাঁক-ফোকর দিয়ে। আশ্চর্য! এতরাতে বনের মধ্যে আলো কিসের? দলবল নিয়ে ওদের খুঁজতে এল গাঁয়ের লোকে? কিন্তু ইঞ্জিন! নাহ্, দেখতেই হচ্ছে।

তাড়াহুড়ো করে খোঁড়ল থেকে বেরিয়ে এল সে।

'কোথায় যাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করল সিসি।

'দেখে আসি!'

'আমরাও আসছি।'

'না, তোমরা ওখানে বসে থাকো...'

'কিন্তু...'

হাসল কিশোর। 'এইমাত্র না বললে নিজেদের দেখাশোনা করার মত যথেষ্ট বড় হয়েছ তোমরা? বসে থাকো। আমি যাব, আর আসব।'

উঠে দাঁড়াতে গেল সে। সোজা থাকতে কষ্ট হচ্ছে। ভাঁজ হয়ে যেতে চাইছে হাঁটু। রক্ত চলাচল স্বাভাবিক করার জন্যে ডলতে শুরু করল খিঁচ ধরা মাংসপেশি। হাত-পা ঝাড়তে লাগল।

মানুষের কণ্ঠ কানে এল। দূর থেকে।

আর দেরি করল না সে। রওনা হয়ে গেল বনের ভেতর দিয়ে।

*

থেমে গেছে মহাকাশযান। স্বচ্ছ গম্বুজ দিয়ে এখনও রাতের কালো আকাশ চোখে পড়ছে। তবে অন্ধকারটা এখানে অনেক বেশি। তারা দেখা যাচ্ছে পৃথিবীর আকাশের মতই। সবচেয়ে মজার

ব্যাপারটা হলো, চাঁদও দেখা যাচ্ছে।

এ কোন্ গ্রহে নামল ওরা?—ভাবছে রবিন। তবে কি টুইন আর্থ আছে যে, এ কথা সত্যি? অবিকল পৃথিবীর মত আরেকটা যে গ্রহের কথা শোনা যায়, সেখানে এসে নামল ওরা? বেরোলেই বোঝা যাবে।

অন্য তিনজনের সঙ্গে আলোচনা করে হ্যাচের সুইচ টিপে দিল রিটা।

খুলে গেল হ্যাচ। নিঃশব্দে নেমে যেতে লাগল সিঁড়ি।

গর্তের মুখটা খুলে হুড়মুড় করে এসে ভেতরে ঢুকল রাতের তাজা বাতাস। ঠাণ্ডা, ভেজা ভেজা। বুক ভরে শ্বাস নিল ওরা।

'আহ্, দারুণ আরাম!' মুসা বলল। 'পৃথিবীর চেয়ে কোন অংশে কম না।'

মই বেয়ে মাটিতে নামল সবাই। খুব সতর্ক। বিপদের সামান্যতম সম্ভাবনা দেখলেও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়বে স্পেস শিপে।

চারপাশে ঘন গাছপালা। ঘন বন। পেঁচার ডাক কানে এল। দূরে নেকড়ে ডাকল।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা, 'এ তো এক্কেবারে পৃথিবীর মত!'

'আমিও তাই ভাবছিলাম,' জবাব দিল রবিন। 'শিওর, এটা সেই টুইন আর্থ। পৃথিবীর যমজ বলা হয় যে গ্রহটাকে, অনেক বিজ্ঞানীই এখন এটার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন...'

বনের মধ্যে খসখস শব্দ হলো।

সবার আগে শুনতে পেল মুসা। ঝট করে ফিরে তাকাল সেদিকে। অন্ধকারের মধ্যে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে ফিসফিস করে বলল, 'কে যেন আসছে!'

*

উপত্যকার একটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল কিশোর।

মেঘ সরে গেছে চাঁদের মুখ থেকে। উজ্জ্বল জ্যোৎস্নায় চকচক করতে দেখল অদ্ভুত একটা গোল জিনিসের পিঠ। আলো আসছে

ওটার নিচ থেকে।

অবাক কাণ্ড! এখানেও ইউ এফ ও?

একবার ইউ এফ ও দেখতে গিয়েই তো আজকের এই দুর্দশা। দ্বিতীয়বার আর কোন বিপদে ঢুকতে চায় না সে। পা টিপে টিপে এগোল।

যতটা সম্ভব কাছে পৌঁছে গাছের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল। গোল জিনিসটার ছয়টা পা।

ছয় পা!

তাই তো! বনের মধ্যে যে ছয়টা গর্ত দেখেছিল, কিসের কারণে হয়েছে সেগুলো, জবাবটা পেয়ে গেল এখন। আরও একটা প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল, ইউ এফ ও-তে করেই তাকে নামিয়ে দিয়ে যাওয়া হয়েছিল এখানে। আবার এসেছে কেন ওরা? তাকে তুলে নিয়ে যেতে?

পেটের কাছে একটা হ্যাচ খুলে সিঁড়ি নামানো হয়েছে। সেটা দিয়ে নেমে এসেছে কয়েকজন মানুষের মত প্রাণী। পোশাক-আশাকে পৃথিবীর মানুষের মতই লাগছে। শুধু তাই না, চেনা চেনাও লাগছে।

গাছপালার আড়ালে আড়ালে আরও কাছে এগোনোর চেষ্টা করল সে। খুব সাবধান থাকল। যাতে কোনমতেই লোকগুলোর চোখে পড়ে না যায়।

কাছে এসে চিনতে পেরে হাঁ হয়ে গেল। নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না।

মুসা, রবিন, জিনা!

আর, আর রিটা গোল্ডবার্গ!

নাহ্, এ সত্যি হতে পারে না!

চোখ ডলল সে। নিজের হাতে চিমটি কেটে দেখল ব্যথা লাগে কিনা।

লাগে! তারমানে যা দেখছে, বাস্তব। নিশ্চয় ওকে উদ্ধার

করতে এসেছে তার বন্ধুরা।

ইউ এফ ও পেল কোথায়? হাইজ্যাক করেছে! আর কোনভাবে পাওয়া তো সম্ভব নয়।

ওদের দিকে দৌড় দিল সে।

চব্বিশ

মিনিট পনেরো পর।

সিসি আর হেনরিকে নিয়ে আসতে রওনা হলো কিশোর। তার সঙ্গে চলল রবিন। বাকি তিনজন মহাকাশযানটার কাছে পাহারায় রইল।

খোঁড়লের কাছে পৌঁছে সিসি আর হেনরিকে বেরিয়ে আসতে বলল কিশোর।

বেরোল দুজনে।

রবিনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল কিশোর। খুশির সংবাদ দিল সিসি আর হেনরিকে–আর ওদেরকে মিছিলে যোগ দিয়ে কষ্ট করে পাহাড় পেরোতে হবে না। মহাকাশযানে করেই দেশে ফিরে যেতে পারবে।

সিসি খুশি হলো, কিন্তু হেনরি হলো না। হঠাৎ ঘুরে এক দৌড় মারল বনের দিকে।

'হেনরি! কোথায় যাচ্ছ, হেনরি!' ওর পিছু নিতে গেল অবাক কিশোর।

তার হাত চেপে ধরল সিসি। 'থাক, যেতে দাও। বাধা দিও না।'

আরও অবাক হলো কিশোর। 'বাধা দেব না মানে?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে সিসি বলল, 'সে অনেক কথা। চলো, যেতে যেতে বলছি।'

হাঁটতে হাঁটতে যে কথা বলল সিসি, বিশ্বাস করতে কষ্ট হলো কিশোরের। অবাক হয়ে ভাবতে লাগল, আর কত চমক অপেক্ষা করছে! জিজ্ঞেস করল, 'কবে থেকে বুঝতে পারলে তুমি?'

'যেদিন হার্ট আঙ্কেল আর তার কোরিআন্টিকে খুন করল হেনরি,' জবাব দিল সিসি। 'সেদিনই বুঝলাম, আঙ্কেলের শিক্ষার কোন প্রয়োজন ছিল না তার। জন্ম থেকেই সে নানা বিদ্যায় পারদর্শী।'

'তারমানে বর্ণ ঈভল!' বিড়বিড় করল কিশোর। 'জন্ম-পিশাচ!'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল সিসি। 'আমার মায়ের পেটে জন্মালে কি হবে, সত্যিকার অর্থে ও আমার ভাই নয়। শয়তান। মা-বাবার রহস্যজনক ভাবে নিখোঁজ হওয়ার ব্যাপারেও ওর হাত আছে কিনা কে জানে! তবে ঘোড়াগুলোকে সে-ই যে নির্দেশ দিয়ে দিয়ে খেপিয়ে তুলেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। মনে মনে কথা বলেছে ওদের সঙ্গে। আমাদের উপকার করার জন্যে করেনি এ কাজ, নিজের স্বার্থে করেছে।...এই যে, এখন, যেই এখান থেকে চলে যাওয়ার ব্যবস্থা হলো, অমনি পালিয়েছে। ও এখান থেকে যাবে না।'

'বুঝে থাকলে এতদিন বলোনি কেন?'

'ভয়ে। যাকে ও শত্রু মনে করবে, নিষ্ঠুর ভাবে শেষ করে দেবে।'

মহাকাশযানের কাছে পৌঁছে গেল ওরা।

সিসি বলল, 'তাড়াতাড়ি উঠে পড়ো। হেনরিকে বিশ্বাস নেই। কখন এসে হাজির হবে শয়তানির মতলব নিয়ে বলা যায় না। আমরা সবাই এখন তার শত্রু। জলদি করো!'

সিসির ধারণাই ঠিক।

মহাকাশযানে উঠে পড়েছে সবাই। সিঁড়িটা সবে তুলেছে, এই সময় বনভূমি কাঁপিয়ে দিয়ে শোনা গেল সম্মিলিত গর্জন। অন্ধকারে অসংখ্য চোখ জ্বলজ্বল করতে দেখল কিশোর। নেকড়ের পাল নিয়ে ওদের ধ্বংস করতে এসে হাজির হয়েছে হেনরি। সবচেয়ে বড় নেকড়েটার পিঠে চড়ে এসেছে সে। ছোটখাট একটা ঘোড়ার সমান নেকড়েটা। শয়তানের উপযুক্ত বাহন। ধক্‌ধক্ করে জ্বলছে নেকড়েগুলোর চোখ।

'জলদি করো!' আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল সিসি। 'ধরতে পারলে রক্ষা থাকবে না আমাদের কারও!'

সুইচ টিপে দিল রিটা। বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করল হ্যাচের ঢাকনা। কানফাটা গর্জন করে ওটার ওপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল বড় নেকড়েটা। কিন্তু মুখ ঢোকানোর আগেই বন্ধ হয়ে গেল ঢাকনা।

'দেরি কোরো না!' সিসি বলল। 'যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পালাতে হবে এখান থেকে। শয়তানের কুবুদ্ধির অভাব হয় না!'

ইঞ্জিন চালুই আছে। অটো পাইলট অন করে দিল মুসা।

*

'আমার বিশ্বাস, এটা মহাকাশযান নয়,' কিশোর বলল। 'অতি আধুনিক কোন আকাশযান। পৃথিবীর মানুষের তৈরি।'

রকি বীচে ফিরে চলেছে ওরা।

'এখন অবশ্য আমারও তাই মনে হচ্ছে,' মনিটরের দিক থেকে চোখ সরাল না মুসা।

'কে বানাল?' রবিনের প্রশ্ন।

'কোন অতি বুদ্ধিমান বিজ্ঞানী,' জবাব দিল কিশোর। 'যা শুনলাম তোমাদের কাছে, তাতে একজনের কথাই মনে আসছে আমার—ডক্টর মুন। ভিনগ্রহবাসী বলে যাদের ধারণা করেছ তোমরা, তারা আসলে রোবট। জ্যান্ত মানুষকে নানাভাবে উন্নত করে রোবট বানিয়েছে সে। তার বশংবদ ভৃত্য করেছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তার লোকেরাই আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল

সেরাতে। তার কাজে বাদ সাধায় আমাদের ওপর একটা আক্রোশ তো তার বরাবরই আছে। এখন মনে হচ্ছে, আমাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর কোনভাবে আমার মগজটাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সে। দুঃস্বপ্ন ভেবেছি যে সব ঘটনাকে, আসলে ওগুলো দুঃস্বপ্ন ছিল না, ঘোরের মধ্যেই করেছি ওসব কাজ। রেগেমেগে শেষে সে আমাকে কাচু-পিকচুতে দ্বীপান্তর দিয়েছিল...'

'দ্বীপান্তর নয়, পাহাড়ান্তর,' শুধরে দিল সিসি। 'পাহাড়ঘেরা দেশ তো।'

'হ্যাঁ, পাহাড়ান্তর,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর। হাসল। সম্পূর্ণ ভিন্ন অচেনা পরিবেশে এত সহজে সিসি মানিয়ে নিতে পারায় খুশি হয়েছে সে। 'যা বলছিলাম। আমাকে বন্দি করে তারপর তোমাদের তুলে আনতে লোক পাঠিয়েছিল। আবার যদি তুলে আনার প্রয়োজন হয় আমাকে, যাতে সহজেই তুলে আনতে পারে, খোঁজাখুঁজি করা না লাগে, সে-জন্যে কোর্স অটো সেট করে রেখেছিল পাইলট। টিপে দিলেই যাতে পৌঁছে যেতে পারে কাচু-পিকচুতে, তুলে নিয়ে আসতে পারে আমাকে।'

'এবং কাজটা সহজ করে দিল আমাদের,' হাসল রিটা। 'খুব সহজেই জায়গামত পৌঁছে গিয়েছিলাম আমরা।'

'সহজ আর কই?' ভুরু নাচাল কিশোর। 'আমাকে উদ্ধারের জন্যে যে কষ্ট তোমরা করেছ, যে ঝুঁকি নিয়েছ...বাপরে বাপ!...ভয়ঙ্কর সব রোবট দানবের সঙ্গে লড়াই!...'

'তা তো বুঝলাম,' বাধা দিল মুসা। 'কিন্তু আবার তো সেখানেই ফিরে যাচ্ছি আমরা। নিশ্চয় মলের ভেতরে বা আশেপাশেই কোথাও রয়েছে ওরা। গেলেই ক্যাঁক করে ধরবে।'

'সেজন্যেই তো সেখানে যাওয়া চলবে না,' কিশোর বলল। 'রকি বীচে নামাবে না স্পেস শিপ–যে বানিয়েছে সে এটার কি নাম রেখেছে, তা যখন জানি না, আপাতত এটাকে স্পেস শিপই বলব আমরা। রকি বীচের আশেপাশে যে কোন জঙলা কিংবা

পাহাড়ী জায়গায় নামাবে, যেখানে মানুষজন তেমন যায় না, লুকিয়ে রাখা যায়।'

রিটা বলল, 'সব প্রশ্নের জবাবই তো পাওয়া গেল, কিশোর, একটা প্রশ্নের জবাব আমি পাইনি এখনও।'

ফিরে তাকাল কিশোর, 'কি?'

'আমি কে? আমিও কি রোবট?'

'এ কথা কেন মনে হলো তোমার!'

'ডক্টর মুনের রোবটগুলো আমাকে ডেলটাদের দলের লোক বলছিল। এই ডেলটারা কারা?'

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটল কিশোর। 'ডেলটা! নামে তো রোবটই মনে হচ্ছে! তবে ওরা যা-ই হোক, আমাদের মতই ডক্টর মুনের শত্রু। সে-জন্যেই ধরে নিয়ে যেতে এসেছিল তোমাকে।'

'তারমানে আমি আসলে কে, জানার কোন উপায় নেই?'

'থাকবে না কেন?' গম্ভীর কণ্ঠে জবাব দিল কিশোর। 'রকি বীচে গিয়ে সুস্থির হয়ে নিই আগে, তারপর বেরোব ডেলটাদের খোঁজে।'

-: শেষ :-

Grohon || Adhare Alor Pothojatri